প্রবেশিকা

ক্যারেল ক্যাপেকের লেখার ভেতরে একটি বিশ্বজনীন সুর খুঁজে পাওয়া যায়। প্রেসিডেন্ট ম্যাজারিকের পরম বন্ধু হিসেবে তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তথাকার গণমনকে অতি নিবিড়ভাবে জানতে পেরেছিলেন এবং তা পেরেছিলেন বলেই তাঁর লেখা শুধু চেক্‌বাসীকেই নয়, দেশজাতি নির্বিশেষে সমস্ত রসগ্রাহী ব্যক্তিকেই মুগ্ধ করে। ক্যারেল ক্যাপেক বস্তুবাদে বিশ্বাস করতেন। নিছক কল্পনার ভিত্তিতে তিনি আর্টকে গড়ে তুলতে কখনো চেষ্টা করেননি। তাই তাঁর লেখার ভেতরে কাল্পনিক ঔপন্যাসিক চরিত্র বিরল। তিনি যাদের প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন এবং যাদের চরিত্রের ছিটেফোঁটা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মনকে প্রভাবান্বিত করে থাকে সে-সব চরিত্রকেই তিনি রূপ দিয়েছেন। তাই তাঁর লেখার ভেতরে মেলে জীবনের আস্বাদ। সূক্ষ্ম রসবোধ এবং সংযমের বাঁধ ছিল বলেই তিনি অতি সাধারণ ঘটনাকেও রসোত্তীর্ণ করতে সক্ষম হতেন। তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে তিনি কোন এক জায়গায় লিখেছেন, "আমাদের গাঁয়ের কসাইটিকে আমার বড় ভাল লাগত। প্রায়ই বিকেলে তার দোকানে আমি যেতাম। সেখানে কসাইটি তার নিপুণ হাতে ধারাল কাটারি দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে মাংস কেটে যেত আর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকতাম কখন অসাবধান মুহূর্তে তার হাতখানা কেটে যাবে তাই দেখবার আশায়। সন্ধ্যা হয়ে যেত, হাতও কাটত না, আমিও হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরতাম।"— অতি সাধারণ ঘটনাকেও রসোত্তীর্ণ করে কেমন চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করা যায়, এ তারই একটি দৃষ্টান্ত।

ক্যারেল ক্যাপেক ১৯৪০ সালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। 'চীট্' উপন্যাস তাঁর শেষ লেখা। নায়ক বেডা ফন্টেনের চরিত্রে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, আর্টকে বেপরোয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার স্বরূপ চালাবার চেষ্টা যাঁরা করেন আর্টের জগতে তাঁদের স্থান হয় না, হয় পাগলা গারদে। ফন্টেন ছিল এই ধরণেরই চালিয়াত শিল্পী গোষ্ঠীর একজন। মুখোস পরে খ্যাতি অর্জন করতে গিয়ে সে হয়ে উঠল শিল্পজগতের এক অদ্ভুত সঙ। ফাঁপা উচ্ছ্বাসের ফানুস হয়ে সাহিত্যের আকাশে ওড়বার দুঃসাহস কারো কারো হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তার পরিণতি যে 'পপাত ধরণীতলে'—এই নির্মম সত্যই প্রকাশ পেয়েছে চীটের নায়ক ফন্টেনের চরিত্রে।

ক্যারেল ক্যাপেকের অন্যান্য রচনার মত চীটেরও বিষয়বস্তু অতি সাধারণ, আমাদের চির পরিচিত, অতি সহজেই মনকে নাড়া দেয়। চীটের অভিনব আঙ্গিক রসজ্ঞ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ইতি—

প্রকাশক

চৗড়

ষোল বছর কেবল ছাড়িয়েছি এমন সময় বেভা ফন্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয়। অবশ্য স্কুলের খাতাপত্তরে বেডরিখ ফন্‌টিন নামটাই তার প্রচলিত ছিল। আমি ভিন্ গাঁ থেকে সে বছর এখানে এসে গ্রামের স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই;—ফন্টেনও তখন সেই ক্লাসে পড়ত। ভাগ্যের ফেরে আমাকে সেই পুরোনো ভাঙ্গা বেঞ্চে ফন্টেনের পাশে গিয়ে বসতে হল।

ফন্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় মনে হয় যেন সেদিনের। তার চেহারা ছিল ছিপছিপে গড়নের, চোখ দুটো নীল ঢেলা ঢেলা। তার সোনালি রংএর কোঁকড়ান চুল নিয়ে সে যে বেশ গর্ব্ব অনুভব করত তা সবাই বুঝতে পারত। তার চাউনির ভেতর সর্ব্বদাই ভাবপ্রবণতা সুস্পষ্ট ফুটে উঠত। প্রথম দিনের আলাপে আমি তার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইনি। লক্ষ্য করলাম, ক্লাসে তার একজন বন্ধুও নেই, আর সেও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সমস্ত ছেলের সংসর্গ ত্যাগ করেছে।

আমি ভাল ছাত্র ছিলাম না, তবে লেখাপড়ায় গাফিলতি কখনো করতাম না এবং হয়ত অধ্যাবসায়ের জোরেই টানাহেঁচড়া করেও শেষ পর্য্যন্ত উৎরে যেতে পেরেছিলাম। ফন্টেনের ধাত ছিল অন্য ধরনের। শ্রেষ্ঠত্বের আসন নেবার জন্য তার ছিল প্রবল আকাঙ্ক্ষা, বাড়ীতে চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না তার এক বিন্দু, কিন্তু ভেতরটা ছিল তার একেবারে ফাঁকা। যখন ক্লাসে তাকে পড়া জিজ্ঞাসা করা হ'ত তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে আরম্ভ করত, ভয়ে কেবল ঢোক গিলত।

মাষ্টারমশাই অতিষ্ঠ হয়ে হাঁকতেন, "খুব হয়েছে, বোস। চুলের পারিপাট্য কমিয়ে দয়া করে একবার অঙ্কের দিকে মনটা দিও ত' বাছা।" ফন্টেন লজ্জায় ঘৃণায় বসে পড়ত, তার নীল ঢেলা ঢেলা চোখ জলে ভরে উঠত। কিন্তু সে তার চাউনি আর হাবভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিত যে সে স্কুল বা মাষ্টারমশাই কাউকেই পরোয়া করে না এবং সে যে পরীক্ষায় কম নম্বর পায় তাতেও তার কিছু এসে যায় না। মাষ্টারমশাইরা তাকে পছন্দ করতেন না, সুবিধে পেলেই তাকে জ্বালাতন করে মারতেন। ক্লাসে ওর অবস্থা দেখে ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হত ;— ওকে সাহায্য করবার চেষ্টাও যে না করতাম তা নয়। প্রথম প্রথম ফন্টেন তাতে খুব অপমান বোধ করত। সমস্ত ছাত্রের সামনে মাষ্টারমশায়ের কটূক্তি শুনে বসে পড়ে জলভরা চোখে রাগে গরগর করতে করতে বলত, "চুপ কর ; কারো সহানুভূতি চাই না আমি।"

কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারল যে আমার সহানুভূতির তার বিশেষ প্রয়োজন। আমার চেয়েও বেশী উৎসাহ নিয়ে সে লেখাপড়ায় মনোযোগী হল। সাধারণ ছেলেদের চেয়ে সে যে বেশী গুণী ছিল সে কথা সত্যি, কিন্তু নিজের ওপর বিশ্বাস তার আদৌ ছিল না অথবা এমন কিছুর অভাব তার ছিল যা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। তবে এইটুকু বুঝেছিলাম যে তার চেয়ে সাহস আমার বেশী ছিল। শিগ্‌গিরই ফন্টেন আমার ওপর অনেকটা নির্ভর করতে আরম্ভ করল, এমন কি তার হয়ে তার বাড়ীর পড়াগুলো লিখে দেওয়াটাও এসে আমার দৈনন্দিন কাজের ফর্দ্দে জুড়ে বসল। কোনদিন ঐ কাজে আমার কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখলে সে এমনি চটে যেত আর বিরক্ত হত যার জন্য আমাকে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমা চাইতে হ'ত।

আমি যতদূর জানি, আমার মতই এক গরীব পরিবারে তার জন্ম। তার বাবা এক অফিসের কেরাণী ছিলেন অথবা ঐরকম কোন কাজ করতেন।

ফন্টেন তার এক পিসিমার সঙ্গে থাকত। এই পিসিমাটি যে কি করে তার ভরণপোষন করতেন তা ভগবানই জানেন, কারণ তার অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ফন্টেনকে তিনি সোহাগ করে বেডরিসেক বলে ডাকতেন। তার বেডরিসেককে তিনি বড় ভালবাসতেন এবং ভালবাসার আতিশয্যে ঐ দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে থেকেও তাকে যতদূর নষ্ট করা সম্ভব তা তিনি করেছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই অভিযোগের সুরে বলতেন, "বেডরিসেক ওদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান। তাইতো ওরা সবাই মিলে ওর পেছনে লাগে। কিন্তু একদিন আসবে যখন ওরা সবাই বুঝবে বেডরিসেকের ভেতরে কি আছে। তখন কি ওরা লজ্জায় মুষড়ে পড়বে না?"

ফ্রিসেক তার ঝাঁকড়া চুলের গুচ্ছ ঝাকুনী দিয়ে খেদের সুরে বলত, "সবাই আমাকে কি ভাবে না ভাবে আমি তাতে থোড়াই পরোয়া করি পিসিমা। শুধু বাবার জন্যই এখনও এখানে পচে মরছি। নইলে কখনই এই জঘন্য স্কুলে আমি থাকতাম না।"

ফ্রিসেকের বাড়ীর পড়া তৈরী করে দেবার জন্য ওর সঙ্গে আমি ওর বাড়ী যেতাম। ওদের একটা মাত্র শোবার ঘর ছিল, আর একটা ছিল রান্নাঘর। শোবার ঘরের অর্দ্ধেকটা জুড়ে ছিল একটা পুরোনো পিয়ানো। কৈশোরের সাধারণ নিয়মানুযায়ী আমাদের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। আমারা ছিলাম এক অদ্ভুত যুগল। তার ছিল ছিপছিপে মেয়েলী চেহারা, নীল ডাগর চোখ, সোনালী ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল, আর আমার ময়লা রং বোকার মত চাউনি; এক কথায় ওর কাছে আমাকে দেখাত একটা জন্তুর মত। সবাই আমাদের এই বন্ধুত্বে হাসাহাসি করত।

একদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, ঘরের উনুনে আগুন জ্বলছিল আর উনুনের পাশে বসে আমরা দুজন নানারকম গল্প করছিলাম……ফ্রিসেক অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল; মাঝে মাঝে তার লম্বা শুকনো হাতখানা তার ঝাঁকড়া চুলের ভেতর চালিয়ে দিচ্ছিল। এক আকস্মিক আবেগে আমার হৃদয় উপছে

উঠছিল। নীরবতা ভেঙ্গে হঠাৎ মৃদুস্বরে অদ্ভুতভাবে ফ্রিসেক "দাঁড়াও" বলেই দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকল। একটু পরেই সে বেরিয়ে এল, গায়ে তার এক বেগুনে রং-এর জামা। তার হাটবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছে। কোন কথা না বলে পিয়ানোর দিকে সে এগিয়ে গেল, তারপর ঢাকনীটা তুলে সামনের টুলে বসে খেয়ালীমনে বাজাতে আরম্ভ করল।

ফন্টেন যে পিয়ানো বাজানো শিখত তা আমি জানতাম, কিন্তু তার নিপুণ সুরকারের ভাবভঙ্গি আমার কাছে একেবারে নতুন ঠেকছিল। ফ্রিসেক বাজিয়ে চলল, এক সুর ছেড়ে আর এক সুর ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও সে বেকিয়ে দিল। দেখলাম চোখদুটো তার বোজা। হাত দুঠো স্থির রেখে তারপর সে ডানদিকে পিয়ানোর ওপর ঝুকে পড়ল আর ধীরে ধীরে হাত চালাতে লাগল। গান যতই জমে উঠল, সেও ক্রমে সোজা হতে লাগল। শেষে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার সমস্ত জোর দিয়ে সে পিয়ানোতে হাত চালাতে লাগল আর মাথাটা ছুঁড়ে দিল পেছনে। সুরের রেশ চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যান্ত সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল—বোধ হয় তার নতুন জগতের দিকে।

গান আমি জানি না, তবে শুনতে খুব ভাল লাগে; ভালমন্দ বিচার করবার শক্তি কিন্তু আমার নেই। ফন্টেনের উচ্ছ্বাসে আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তবু বলে উঠলাম "চমৎকার!"

ফ্রিসেক যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল; আঙ্গুল দিয়ে কপালে টোকা মারতে মারতে ক্ষমা চাইবার সুরে বলল, "পাগলামী করে ফেললাম, আমাকে মাফ্ ক'রো। কিন্তু এই প্রেরণার কাছে সত্যি আমি বড় দুর্বল।"

আমি অভদ্রের মত জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐ বেগুনে রংএর জামাটা কেন পরলে তুমি?"

ঘাড় দুলিয়ে ফ্রিসেক উত্তর করল, "বাজাবার সময় ওটা আমি পরে থাকি। ওটা ছাড়া আমি সৃষ্টি করতে পারি না, বুঝেছ?"

সত্যি কথা বলতে কি আমি কিছুই বুঝিনি। ফন্টেন আমার কাছে এগিয়ে এল, হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "সাইমেক্, মনে রেখো একথা কাউকে বলবে না। এটা আমাদের একান্ত নিজের—গোপন।"

কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না. জিজ্ঞাসা করলাম, "গোপনটা কি?"

—"আমি যে একজন শিল্পী, তাই।"—মৃদুস্বরে ফন্টেন উত্তর দিল। "তুমি তো জান একথা জানলে সবাই আমাকে ঠাট্টা করবে, আর মাষ্টারগুলোও নিশ্চয়ই এ নিয়ে হাসাহাসি করবে। জান, ঐ মাষ্টারগুলো যা আমাকে শেখায় সেগুলো আমি খুব তুচ্ছ বলেই মনে করি। যখন ক্লাসে ব্যাকরণের সূত্র বলবার জন্যে আমাকে দাঁড়াতে হয় তখন যে আমি কত অপমান বোধ করি তা তুমি জান না। আমি ক্লাসে বসে থাকি আর শুনি গান, শুধু গান।"

—"তুমি যে শিল্পী তা তুমি কবে জানলে?"

—"অনেকদিন। দু'বছর আগে আমি এক গানের আসরে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম একজনকে বাজাতে। ওঃ, সে কি আশ্চর্য্য! বাজাতে বাজাতে চুলগুলো তার এলিয়ে পড়ল পিয়ানোর ওপর। সেদিন আমি বুঝতে পেরেছি. সেদিন!······আচ্ছা, আমার এখানে স্পর্শ কর তো—আমার মন্দির। কিছু বুঝছ?"

—"কি বুঝব?"—আমি হতবুদ্ধি হয়ে বললাম। যতটুকু বুঝলাম তা শুধু তার কুকুরের লোমের মত এক গোছা ঝাঁকড়া চুল।

—"এই তো আমার মন্দির, আমার প্রতিভার উৎস। আমি একে বুঝতে পেরেছি সাইমেক, আমি একে অনুভব করেছি।"

সেদিনের ঘটনাগুলো এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘর অন্ধকার, উনুনের ঝাঁঝরার ভেতর দিয়ে জলন্ত কয়লা পড়ে মাঝে মাঝে ঘরটা আলোকিত হচ্ছে; তারই মাঝে আমরা দুটি বিহ্বল বালক হাতে হাত রেখে বসে আছি। আনন্দের অতিশয্যে ওর ঠাণ্ডা হাতখানা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চাপা সুরে বলে উঠলাম, "ফ্রিসেক···ফ্রিসেক!"

ফন্টেন স্নেহমাখা স্বরে বলল, "আমাকে বেডা বলে ডেকো। স্কুলে নয়, শুধু আমাদের দুজনের ভেতর। এটা আমার গানের নাম—বেডা ফন্টেন। এ নাম কিন্তু আর কাউকে বলো না। হ্যাঁ,…তোমাকে কি বলে ডাকব ?"

—"সাইমন।"—ইতস্ততঃ না করে বলে ফেললাম। "তুমি কবিতা লিখতে পার, বেডা ?"

—"ক—বি—তা ?"—লম্বা টানা স্বরে ফ্রিসেক বলল। "কেন, তুমি লেখ নাকি ?"

—"হ্যাঁ, লিখি।"—আঃ, বাঁচলাম; এতক্ষণ হিংসায় জলেপুড়ে মরছিলাম। তুমি মনে করো না ফ্রিসেক যে তুমি একাই এক মস্ত ওস্তাদ। …বিনীত স্বরে বললাম, "এ পর্য্যন্ত আমি দু'খাতা কবিতা লিখেছি।"

ফ্রিসেক আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "তাহলে তুমি কবি! একথা আগে তুমি আমাকে বলনি কেন? সাইমন, তোমার কবিতা আমাকে দেখাবে ?"

—"আর এক সময় দেখাব।"—আমি লজ্জিত হয়ে বললাম। "আচ্ছা, তুমি নিজে কেন লেখ না ?"

অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টেতাকিয়ে থেকে সে বলল, "আমি? আশ্চর্য্য ব্যাপার কি জান! এক এক সময় আমি কবিতায় ভাবি, নিজের অজান্তেই হঠাৎ কি যেন গুন গুন করতে থাকি, আর সেগুলো সবই কবিতা। লেখার অবকাশ আমার নেই, আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।"

আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাকে কবিতা লিখতে হত, কল্পনার আতিশয্যে কলম কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলতাম, কেটে-কুটে লেখাগুলো অবোধ্য করে তুলতাম —আর তার কিনা আপনা থেকেই কবিতা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে! তবে কি আমার ভেতরে প্রেরণার অভাব? আর তাই যদি হবে তবে কেন আমি কবিতা লিখতে সাহসী হতাম? হায়, যুগধর্ম্ম কি কেউ এড়াতে পারে? আজকালকার ছেলেরা যেমন

খেলা-ধুলোর ভেতর নিজেদের ডুবিয়ে রাখে, আমাদের সময় তা ছিল না। তখন প্রায় সব ছেলেই অল্পবিস্তর কবিতা লিখত, ক্লাসের অর্দ্ধেক ছাত্র লিখত লুকিয়ে লুকিয়ে। রোগটা আমাকেও পেয়ে বসেছিল। আমার কয়েকটা রচনা ছাপাও হয়েছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে এখন কেউই খোঁজ নেয় না, আমিও না। কি গতিহীন, অপরিণত রচনাই না ছিল সে-সব।

অন্ধকারের ভেতর থেকে ফ্রিসেক বলে উঠল, "তুমি এরকম কবিতা লেখ—পল্লবিত বার্চ ছায়ে কে তুমি দাঁড়ায়ে, অয়ি অনাবৃতে ?"—

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি দেখেছ ?"—

—"হ্যাঁ।"

—"কোথায় ?"

—"তা তোমাকে বলতে পারব না। তার নাম······ম্যানুয়েলা।" —চুলের ভেতর হাত চালিয়ে দিয়ে সে বলে চলল, "কিসের ভেতর দিয়ে যে আমাকে জীবনটা চালিয়ে দিতে হয়েছে, তা তুমি কি করে বুঝবে সাইমন! হ্যাঁ, শিল্পীমাত্রেরই জীবনে নানারকমের অভিজ্ঞতা আসে। বহু মেয়ে আমার জীবনে এসেছে।"

—"এখানে ?"—সন্দেহের সুরে অভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। কথাগুলো আমার কাছে যেন কেমন কেমন ঠেকছিল, বিশেষ করে ফ্রিসেকের মত লাজুক প্রকৃতির ছেলের সম্পর্কে।

—"না, আমার দেশে। সেখানে আমার বাবা কাউন্টের প্রতিনিধি কিনা। একদিন সন্ধ্যেবেলা আমি তো আনমনা হয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছি, কাউন্টের স্ত্রী তা শুনে ফেলল। তারপর থেকেই সে আমাকে তার প্রাসাদে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করত।···ঐ যে, তোমাকে বার্চ গাছের কথা বলছিলাম না, সেগুলো ওদেরই বাগানে ছিল। যখন খুশি ঐ বাগানে আমি যেতাম; প্রায়ই ওদের ওখানে আমাকে বাজাতে হত। কাউন্টের স্ত্রীও চমৎকার বাজাতে পারত; আমার চুলগুলো সে ভারী পছন্দ করত।"

সবই যেন আমার কাছে অসম্ভব বলে ঠেকছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, "সুন্দরী সে?"

—"অদ্ভুত!"—নিপুণভাবে ফ্রিসেক বলে ফেলল। "ওর মেয়েকে আমি পিয়ানো বাজানো শেখাতাম। মেয়েটি স্পেনীয় আদবকায়দায় মানুষ।"

—"ও, সেই বুঝি ম্যানুয়েলা?"

—"না, ইসাবেল্ মেরিয়া ডোলরেস্ তার নাম। একেবারে শিশু, মাত্র ষোল বছর বয়স।......সত্যি, মেয়েটি আমাকে ভালবেসেছিল, কিন্তু বুঝতেই তো পার—", ঘাড়টা একবার দুলিয়ে বলে চলল, "বুঝতেই তো পার, ওর মা আমাকে বিশ্বাস করত! ওঃ, এড়িয়ে চলা, সে কি যে-সে কাজ! হ্যাঁ, একদিন একটা চুমুও খেয়েছিলাম, কিন্তু তার মনে যে কিসের আগুন জ্বলছিল তা তুমি কি করে বুঝবে!......জান, শিল্পী কোন আইনের ধার ধারে না। জীবনের সীমাহীন অধিকার তার আছে, তার অভিজ্ঞতা থেকেই সে করবে সৃষ্টি।......কথা দেও সাইমন, তুমি এসব কথা আর কাউকে বলবে না, কথা দেও।"

ক্রমেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। হাতটা তার কাঁপছিল, আবেগে বলে চলল, "কাউন্টের স্ত্রীও আমাকে তার ভালবাসা নিবেদন করেছিল। তুমি কবি সাইমন, তুমি সব বুঝবে। তুমিও নিশ্চয়ই সংস্কারকে ঘৃণা কর, তাই না!......আঃ, ইসাবেল! কি অপরূপ রূপ তার!......সাইমন, আজ তোমাকে আমি আমার গোপন জীবনের কথা বলছি, তাই আজ আমি পাগল হয়ে পড়েছি, বাঁধনহারা হয়েছি।" —সমস্ত সময়েই সে তার ছেলেমিতে ভরা হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে, যেন সে কিছু ধরতে চায়।

কথাগুলো সবই যেন আমার গুলিয়ে যাচ্ছিল। পৃথিবীতে নাটকীয় সব কিছুই আমি বিশ্বাস করতে রাজী ছিলাম, কিন্তু এখানে সব কিছুর ভেতরেই যেন কেমন খটকা লাগছিল। এ খটকা কেন? তবে কি আমার ভেতর

কল্পনাশক্তির অভাব? ভেবেই খুব লজ্জিত হয়ে পড়লাম। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম, বললাম, "বলে যাও।"

—"হ্যাঁ বলছি," থতমত খেয়ে ফ্রিসেক বলল, "বিরাট কিছু অভিজ্ঞতার পরে আমি অতি সহজেই সৃষ্টি করতে পারি। ভালবাসা অথবা বিরহ—সবই আমার চিন্তার খোরাক যুগিয়ে দেয়। অভিজ্ঞতা—এ যে সাধনারই অঙ্গ। ······হ্যাঁ, তোমার কথাও কিন্তু আমাকে একদিন বলতে হবে। ······সাইমন, ডায়নিসস্ আমার আদর্শ, সেই ছাঁচেই আমি নিজেকে গড়েছি। ······কে? ······চুপ! পিসিমা আসছে।"

বৃদ্ধা মোমবাতি হাতে ঘরে ঢুকলেন, বললেন, "অন্ধকার ঘরে তোমরা কি করছ?"

থতমত খেয়ে ফ্রিসেক বলল, "ইতিহাস পড়ছি।"

সেই দিন থেকে আমাদের বন্ধুত্ব অসম্ভব রকম বেড়ে চলল। মানুষের প্রথম বন্ধুত্ব ও প্রথম ভালবাসা একই সুরের—আবেগে ভরা। আমাদেরও তাই হয়েছিল। ফল্‌টিনের ছিল ডায়নসীয় চরিত্র, মেজাজ ছিল তার খাপছাড়া আর ছিল সে কল্পনাবিলাসী। হাঁটবার সময় টুপিটা হাতে করে হাঁটত; হাওয়া যে তার ঝাঁকড়া চুলগুলোকে দোলা দিয়ে যেত সেদিকে তার খেয়ালই থাকত না। সে ডায়নিসস্ আর আমি হেফাইষ্টস্—দু'টী অতিমানবের সমন্বয়;—বোয়েসিয়ান্ আর ফেয়সিয়ান্‌দের প্রতি আমরা যুগল ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাতাম। এ হেন কল্পনার রাজ্যে মানুষ যখন বিচরণ করে তখন কি গ্রীক আর ল্যাটিন ক্লাসে পড়ার দিকে তাদের খেয়াল থাকে! ক্লাসে পড়া বলবার সময় ডায়নিসসের ঠোঁটদুটো আগের মতই কাঁপত আর হেফাইষ্টস্ সেই সময় বেঞ্চের নীচে হাঁটুর ওপর বই রেখে তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে যেত ডায়নিসসকে এই সাংঘাতিক অবস্থা থেকে রেহাই দিতে। অবশেষে মাষ্টারমশায়ের কাছ থেকে গালমন্দ খেয়ে ডায়নিসসকে সেই পুরোনো ভাবেই জলভরা চোখে বসতে হত, হেফাইষ্টসও তখন বেঞ্চের নীচে তার হাতখানা ডায়নিসসের হাতের ওপর চালিয়ে দিত।

ভাগ্য এড়াতে পারে এমন শক্তি দেবতাদেরও নেই, আমরা তো কোন ছার!

একদিন সত্যি সত্যি সে তার এই অন্তঃসারশূন্য পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। সেদিন টেকো মাষ্টারমশাই তাঁর দৈনন্দিন বকার পালা শেষ করে বলে ফেল্লেন "ফল্‌টিন, তোমার চুলগুলো কবে কাটবে বল তো? দোহাই তোমার, মাথার ভেতরে মগজের বদলে ঐ যে খানিকটা গোবর ঠাসা রয়েছে তাতে একটু হাওয়া ঢুকতে দেও।"

ক্রিসেকের মুখ লাল হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে বেঞ্চে ঘুসি মেরে বলল, "এটা স্কুল, চুল-কাটার দোকান নয়। আমার চুলের সঙ্গে আপনার পড়াবার কোন সম্পর্ক নেই, আর আপনি তা ছুঁতেও পারবেন না।" —ক্রিসেকের এই ঔদ্ধত্য স্কুল কর্তৃপক্ষের নজর এড়াল না। সে কিছুদিন স্কুলের ভেতরে গভীর আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। ক্রিসেক কিন্তু মাথা নত করল না, শিল্পীর ভঙ্গিতেই চুলের গুচ্ছ সে পুষতে লাগল। মাষ্টারমশাইও আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

আরো কিছুদিন গত হ'ল, তারপর আমাদের ভেতরেও একদিন বিচ্ছেদ ঘটল, —আমার কবিতা নিয়েই। আর কেউ আমার কবিতা দেখবে, এতে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হতাম। তবু সে আমাকে এমনি ভাবে ধরল যে বিশেষ অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার কবিতার খাতা দুটো তাকে এনে দিতে বাধ্য হলাম। কবিতাগুলো কেমন লাগছে বলতেও আমি সাহস পেতাম না, আর সেও যে আগে থেকে কিছু বলবে তারও আভাষ পেলাম না। কয়েকমাস পরে নিরুপায় হয়ে একদিন আমি তাকে সেগুলো ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলাম।

ক্রিসেক আশ্চর্য্য হয়ে বলল "কোন্ কবিতাগুলো?"

—"যেগুলো তোমাকে দেখতে দিয়েছিলাম।"

ক্রিসেক খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর অপমানের সুরে বলল, "ও বুঝেছি,

আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না! বেশ, আমি কালকেই সেগুলো ফিরিয়ে দেব।"

আর কোন কথা হল না, রাস্তা দিয়ে নীরবে দুজনে চলছিলাম। কি যেন সাংঘাতিক অকৃতজ্ঞতার কাজ করেছি এমনিভাবে সে আমাকে উপেক্ষা করে চলছিল। হঠাৎ থেমে তার রক্তশূন্য হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, "ধন্যবাদ, বিদায়।"

—"আমি তোমার কি করেছি!"—হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

চোখের জল কোনরকমে সামলে নিয়ে সে বলল, "কিচ্ছু না! ভেবেছিলাম, তোমার কয়েকটা কবিতায় আমি সুর দেব। কিন্তু তুমি··· তুমি ভাবলে আমি সেগুলো চুরি করব।"

—"তুমি তো সে কথা আগে আমাকে বলনি?"

—"ইচ্ছে ছিল, সুর দিয়ে তোমাকে তাক লাগিয়ে দেব। একটা প্রায় শেষ করেও এনেছিলাম; ঐ যে সেটা—'মেঘলা আকাশতলে হায়, আমি হেথা একা!"

ক্রিসেকের শুকনো হাতখানা আমি জড়িয়ে ধরে বললাম, "ভুল বুঝো না ক্রিসেক, আমি তো এসব কথা জানতাম না। আমার কবিতা যে তোমার ভাল লেগেছে এটা কি কম আনন্দের কথা! কেন তুমি আগে একথা বলনি?"

—"কোন শিল্পীই আর একজন শিল্পীর কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করতে পারেনা। তুমি আমাকে এতখানি অবিশ্বাস কর! ভয় নেই, আমি সমস্তই তোমাকে ফিরিয়ে দেব। কেন, আমি কি নিজে লিখতে পারি না?" চলে যেতে উদ্যত হয়েছে, চট করে আমি তাকে ধরে ফেললাম, বললাম যতদিন খুশি সে যেন কবিতাগুলো তার কাছে রেখে দেয়।

—"তোমার এসব কথা বলা উচিত হয়নি।" ক্রিসেক বলে চলল, "তুমি

তো জান, আমি একটা যাযাবর। কার কাছ থেকে কি নিয়েছি, কাকে কি দিতে হবে, তা কি ছাই আমার মনে থাকে!"

* * *

ক্রিসেক বেঁকেই রইল, আমার সঙ্গে একরকম কথাই বলত না।

এই সময় আমাদের ক্লাসের পরীক্ষা চলছিল, আর ক্রিসেকও পরপর ফেল করে যাচ্ছিল। আমি বহুভাবে তাকে সাহায্য করতে চাইতাম, কিন্তু আমার সাহায্য সে গ্রহণ করত না। তার জলভরা চোখ দেখলে বড্ড কষ্ট হত। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু সে পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকত, আমার সঙ্গে কথাও বলত না। যেন তার কম নম্বর পাওয়া সেও আমারই দোষ! খুব দুঃখ পেতাম ওর জন্য, আমার জন্যও।

কয়েক দিনের মধ্যেই ক্রিসেক আর এক নতুন বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসল। আমার সঙ্গে নয়, এবার যে তার বন্ধু হ'ল সে হচ্ছে ক্লাসের সবচাইতে ভাল ছেলে। মাষ্টারমশাইরা সবাই তাকে ভালবাসেন; শান্ত, ধীরস্থির ছেলে সে, চেহারাটাও মেয়েলি ধরনের। ক্লাসের ছেলেরা কেউ তাকে পছন্দ করতনা। তার ঐ সুবোধ বালকত্বে সবাই তার ওপর চটে থাকত। কি করে যে ওরা দুজন বন্ধু হ'ল তা আমি বলতে পারি না। আমিও মনে মনে চাইতাম ঐ ভাল ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করতে, তাই ওদের বন্ধুত্বে আমার বড্ড হিংসা হত।

একদিন অধৈর্য্য হয়ে ক্রিসেককে বললাম, "তুমি আমার কবিতার খাতা ফিরিয়ে দেবে না?"—ক্রিসেক কোন উত্তর করল না, ঘাড়টা দুলিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

পরের দিন ক্লাস চলছে, এমনি সময় ক্রিসেক এমন ভাবভঙ্গি দেখাল যে তক্ষুনি সে মূর্ছা যাবে।

—"কি হয়েছে, ফল্‌টিন?"—মাষ্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

ফলটিন নাক সিঁটকে বলল, "এখানে বসতে পারছি না, স্যার। সাইমেকের গা দিয়ে বিশ্রী একটা গন্ধ বেরুচ্ছে।"

লজ্জায় রাগে আমি লাল হয়ে গেলাম, বললাম, "কক্ষনো না, কক্ষনো না।"

—"সাইমেক বড় নোংরা কিনা, তাই ওর গা দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে।"

কটমট করে তাকিয়ে মাষ্টার মশাই বললেন, "অন্য কোথাও ব'স, পড়াবার সময় গণ্ডগোল করো না।"

ফলটিন বইগুলো গুছিয়ে একটু মুচকি হেসে তার নতুন বন্ধুর পাশে গিয়ে বসল।

তারপর থেকে আমি তার সঙ্গে আর কথা বলিনি। কবিতার খাতাদুটোও আজ পর্যন্ত ফিরে পাইনি।

* * *

বেডরিখ ফলটিনের স্মৃতি আমার শিশুসুলভ ভাবাবেগ দিয়েই আমি রাঙ্গিয়ে রেখেছি কি না বলতে পারি না। এখন বিচারপতি হিসেবে মানুষের কার্যকলাপ, বিশেষ করে কৈশোরের অসংলগ্ন ব্যবহার সহানুভূতির দৃষ্টিতে সহজভাবেই দেখে থাকি, তাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। স্কুলে সেদিনের ঘটনার পরে আমি খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম নদীতে ডুবে মরি না কেন! কিন্তু আজ বুঝেছি ফলটিন যে সেই ভাল ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিল তার প্রধান কারণ—আমার মত একজন সাধারণ ছেলের কাছ থেকে সে যতটুকু সাহায্য পাবে তার চেয়ে ঢের বেশী পাবে ওর কাছ থেকে। আর এ ঘটনার পর থেকে ফলটিন লেখাপড়াতে অনেকটা ভালও হয়ে গেল। তবে লেখাপড়ায় সাহায্য পাওয়াই যে ফ্রিসেকের একমাত্র কাম্য ছিল. তাও বোধ হয় নয়;—ঐ কচি বয়সের আবেগ, কৈশোরের উন্মাদনা—তারও কি

অভাব ছিল এদের বন্ধুত্বে! আমার বেশ মনে আছে, একদিন হেডমাষ্টারমশাই ওদের দুজনকে ডেকে নিয়ে গোপনে কি যেন বলেছিলেন। কি কথা যে ওদের সঙ্গে হেডমাষ্টারমশায়ের হয়েছিল তা আমরা কেউই জানতাম না। তবে একটা কিছু গোপনীয় বিষয়ে তদন্ত যে চলছিল সে কথা আমাদের কানে এসে পৌছেছিল।

চট করে কারো সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে নেই, এই সত্য আমি আমার পেশার ভেতর দিয়ে শিখেছি। ফল্‌টিনের চরিত্র যে আমার কাছে সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে তা আমি জোর করে বলতে পারি না, তবু ঘটনাগুলো বিচার করে যতটুকু অনুমান করতে পারি তাতে মনে হয়,—অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছেলে সে, সীমা ছাড়িয়ে আশা করত; হয়ত বা মনে শিল্পের প্রভাবও সামান্য ছিল। সাধারণ ক্ষেত্রে কিছু নাম কেনাও অসম্ভব হয়ত হত না, কিন্তু পিসিমার আদর ওর সর্বনাশ করেছিল। গর্ব আর মিথ্যাচার ওকে বিষিয়ে তুলেছিল, সামাজিক ও দৈহিক হীনতা ওকে বড় পীড়িত করত। ফাঁপা উচ্ছ্বাসই ছিল ওর পথ চলবার প্রধান পাথেয়।

[বিচারপতি সাইমেকের ডায়েরী]

বেডা ফন্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সে যখন গ্রামের স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে পড়ত। আমরা পাড়াগাঁ'র মেয়ে, তাই তার প্রতি আমাদের আকর্ষণটা একটু গেঁয়ো ধরনের ছিল। আমাদের ভেতরে তার সম্বন্ধে আলোচনাও হ'ত যথেষ্ট, 'প্রিয়দর্শন ছাত্র' বললেই আমরা বুঝতাম তার কথা হচ্ছে। সে নাকি মেয়েদের একেবারেই পছন্দ করে না—এতে তার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। ঝাঁকড়া চুল, নীল ডাগর চোখ, ছিপছিপে চেহারা—এ সবে তাকে বেশ দেখাত। চুলগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে টুপিটা হাতে নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে সে যখন পথ চলত তখন মনে হ'ত সে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছে। তার ভাবভঙ্গিতে তাকে আমরা কবি বলে মেনে নিয়েছিলাম আর এজন্যেই তাকে আমাদের মনে ধরেছিল। অবশ্য এই রকম মনে ধরাটা আমাদের সময় মোটেই অসঙ্গত ছিল না। এখন সবই বদলে গিয়েছে; আমার মেয়ের এবং অন্যান্য আধুনিকার চালচলনে গদ্যভাবটাই বেশী দেখি, সেই কবিপ্রাণ যেন এদের ভেতর এখন আর নেই। হয়ত এটা প্রগতিরই রূপ, কিন্তু আমি একে বরদাস্ত করতে পারি না।

নাচের স্কুলেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ফন্টেন আমাকে তার সঙ্গে নাচবার জন্যে অনুরোধ করল। আমার বেশ মনে আছে, আমাকে অভিবাদন করে তার পরিচয় দিয়েই সে একটু ঘাবড়ে গেল। আমিও যে লজ্জা পাইনি তা নয়, তবে অতটা নয়। কয়েক পা নেচেই আবিষ্কার করলাম, নাচে সে মোটেই পটু নয়। নাচে তার বিতৃষ্ণা সেও আমাকে জানিয়ে দিতে দেরী করল না, আর সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "গান ভালবাস?"—গাইতে জানতাম না বলেই গান পছন্দ করতাম না, তবু ইতস্তত: না করে, বলে ফেললাম, "পৃথিবীতে ওটাই আমি সবচাইতে বেশী ভালবাসি।"

খোলাখুলি মিথ্যা বলা—যৌবনের এই অদ্ভুত ধর্মের কোন অর্থ খুঁজে

পাই না। আনন্দের সঙ্গে ফন্টেন বলল, "বাঃ, তাহলে তো দেখছি আমরা দুজন দুজনকে ভালভাবে জানতে পারব।" তক্ষুনি সে তার পা দিয়ে আমার একটা পায়ে চাপ দিল।

সেই মুহূর্তে তার প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা আমাকে ছেয়ে ফেলল। কেন এই বিতৃষ্ণা এল!—হয়ত তাকে সত্যি কথা বলিনি, এই জন্যে। মনে হতে লাগল, তার নাকটা অত্যন্ত লম্বা, থুতনিটা কেমন যেন বিদঘুটে, হাত দুটোও যেন অস্বাভাবিক রকমের। আর, এই বিতৃষ্ণা থেকেই আমার প্রথম ভালবাসার উন্মেষ। এর আগে আমি কমপক্ষে আরো দুজনের প্রেমে পড়েছিলাম, কিন্তু শুধু প্রেমে পড়লেই তো আর হ'ল না! ভালবাসার পাত্রটি আমার নিজের সম্পত্তি এই চেতনার অভাব তখন ছিল।

নাচের স্কুল থেকে আমরা একসঙ্গে ফিরতাম, মাঝে মাঝে বিকেলে বেড়াতেও যেতাম। বাড়ীতে মিথ্যে অজুহাত দিতে হ'ত, বলতাম কোন বান্ধবীর বাড়ী যাচ্ছি। সেদিন এখন আর নেই,—আমার মেয়ে খোলাখুলি ভাবে আমাকে বলে দেয়—তার এক যুবক বন্ধুর সঙ্গে সে বেড়াতে যাচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে দুজন পাশাপাশি চলবার সময় ফন্টেন যখন ভারিক্কি চালে বড় বড় কথা বলত তখন তাকে আমার বড্ড ভাল লাগত। মেয়েদের মাঝে বুক ফুলিয়ে চলতাম, বুঝিয়ে দিতাম 'প্রিয়দর্শন ছাত্র'কে শেষ পর্য্যন্ত আমিই জয় করলাম! হ্যাঁ, ম্যানিয়া একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিল বটে, কিন্তু তার কি ফন্টেনের মত ওরকম চুল আছে? আর এলিস্কা! ও যাকে ভালবাসে সে যে ওর আত্মীয়! মনে মনে যথেষ্ট গর্ব্ব হ'ত—সে কবি, সে গায়ক!

চুলগুলো ঝাকুনি দিয়ে ফন্টেন বলত, "আচ্ছা জিৎকা, কোন্‌টাকে বেছে নেব বল তো? কবিতা, না গান? মহাসমস্যায় পড়েছি। তুমি হলে কি করতে?"—আমার কাছে দু'ই সমান, দুটোকেই আমি ভয়ানক

ভালবেসে ফেলেছিলাম। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললাম, "কোনটাই ছেড়ো না বেডা। এমন দিন তোমার আসবে যখন তুমি কবিতা লিখবে আর তাতে দেবে সুর—রিচার্ড ওয়্যাগার মত।" (ওয়্যাগার নাম উল্লেখ করে গর্ব্ব অনুভব করলাম।)

কথা বলতে বলতে আমরা বাড়ী থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। বেডা আমার হাতটা তার হাতের ভেতর তুলে নিয়ে আবেগের সুরে বলল, "এর আগে অন্য কোন মেয়ে আমাকে এমন করে জানতে পারেনি জিংকা।"—সে আমাকে জড়িয়ে একটা চুমু খেল, আবেগের আতিশয্যে তার ঠোঁট দুটো আমার নাকের ডগায় গিয়ে ঠেকল। কিন্তু তাতে কি এসে যায়! আমি বেডার মত একজন সাধককে বুঝতে পেরেছি একি যে-সে ব্যাপার! তার কথাটা আবার মনে মনে আওড়ে নিলাম। কিন্তু, কিন্তু সে ত' বল্লেচে অন্য কোন মেয়ে তাকে এমনি করে জানতে পারেনি। তবে কি আর কোন মেয়ে তাকে ভালবাসে? চট্‌ করে গম্ভীর হয়ে গেলাম, দূরে সরে গিয়ে রাস্তার অন্য পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম; নিজেকে রহস্যময়ী করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু—কেন?

বেডা হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কম্পিত সুরে বলল, "কি হয়েছে জিংকা?"

এপাশে ওপাশে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে চললাম, ভাবলাম গোধূলিতে আমাকে বিষাদময়ী দেখাচ্ছে নিশ্চয়ই। কোন সন্দেহের কারণ নেই এমনি ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে আর কেউ ভালবাসে?" —কথাটা বলেই যেন বোকা বনে গেলাম। হায় ভগবান, কি করে মুখ দিয়ে একথা বের হল! আপনা থেকে সে ভালবাসা না চাইলে আমি তা দেব না এটাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। ওমা, এ যে আমিই নিবেদন করে বসলাম!

আমার অস্বস্তি বেডা লক্ষ্য করল। মাথাটা একবার নুইয়ে, চুলে হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে বলল, "হ্যাঁ, বেসেছে।"

—"কে ?"

—"সাইমংকা।"—মৃদুস্বরে বলল !

—সাইমংকা ! কি বিদঘুটে নামরে বাবা ! তবু জিৎকা থেকে তো ভাল বললাম, "তুমি তাকে ভালবাসতে, না ?"

হাতটা দুলিয়ে সে বলল, "ঠিক ভালবাসিনি…………এই, একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। ওসব তুমি বুঝবে না জিৎকা ; তুমি ছেলে মানুষ।"

—অপমান বোধ করলাম, প্রতিবাদ ক'রে বললাম, "কি, আমি ছেলেমানুষ !"

"—আমাকে ক্ষমা ক'রো"—নম্রভাবে বেডা বলল।

উত্তর না দিয়ে তার হাতটা আমার হাতে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিলাম।

সেদিন থেকে আমাদের ভেতর এক গভীর ভালবাসা গড়ে উঠতে লাগল। কথায় বলে এক আত্মা, এক প্রাণ—আমরা দুজন হলাম তাই। রাস্তায়, নদীর পারে নির্জনে দুজনে বেড়াতে যেতাম ; সন্ধ্যা হয়ে যেত, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতাম, আর বাড়ী ফিরে মার কাছে নানারকম মিথ্যে কথা বলতে হ'ত। সত্যি, এসবের ভেতর প্রাণ ছিল।

বেডার প্রেমে আমি একেবারে ডুবেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যেভাবেই হোক না কেন, আমাকে সোহাগ করতে চাইলেই আমি তার ওপর ভয়ানক চটে যেতাম। তার সব কিছুই তখন আমার কাছে কুৎসিত হয়ে দেখা দিত। আমাকে ঐ ভাবে পাওয়ার জন্য তার এ অদম্য উৎসাহ কেন তা আমার কাছে তখন অবোধ্য ঠেকত, পরে অবশ্য কিছুই বুঝতে বাকী ছিল না। তার সোহাগে সাড়া না দেওয়াতে সে আহত হ'ত, হতাশার স্বরে বলত, "তোমার কি বিন্দুমাত্র অনুভূতি

নেই ?”—লজ্জায় লাল হয়ে উঠতাম, নিশ্চয়ই সাইমংকা আমার মত নয়।

আমাদের ভালবাসা বেড়েই চলল। ফন্টেন তার গানের কথা, তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার কথা, তার নিজের কথা আমাকে গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞের মত বলত, আমি অবাক হয়ে শুনতাম। শিল্পীদের যে অশেষ দুঃখ বরণ করতে হয়, একথা সে আমাকে বহুভাবে বুঝিয়ে দিত। তাকেও যে স্কুলে শিল্পবিরুদ্ধ আবহাওয়ায় পড়ে লড়তে হয়েছে এবং হচ্ছে তাও সে আমাকে জানিয়ে দিত। এই বিষয়ে তার প্রতি আমার সহানুভূতি একটু বেশীই ছিল, কারণ ক্লাসের ঐ বদ্ধ আবহাওয়ায় আটক থাকার চাইতে বাইরে মাঠেঘাটে দুজনে বেড়ান কি বেশী উপভোগ্য নয়?

আমাকে তারিফ করে বেডা বলত, “তুমিই আমাকে ঠিক বুঝেছ জিংকা। তুমিই আমার প্রেরণার উৎস।” কথাগুলো আমার বড্ড ভাল লাগত; উত্তরে আমার কিছু বলবার বিশেষ প্রয়োজন হত না, কারণ বেডাই আগাগোড়া একথা ওকথা ব’লে যেত।

মাঝে মাঝে বেডা আমাকে বলত যে, আমাকে দেখবার আগে সে নাকি ভয়াবহ রকমের লাম্পট্য-জীবন যাপন করত। সে বলত; “আমি ভয়ানক কামুক, জিংকা। আর দেখ, শিল্পীমাত্রেই অল্পবিস্তর কামুক হয়ে থাকে।”

কান লাল হয়ে ওঠে আর হাত কাঁপতে আরম্ভ করে, মানুষের এই অবস্থাকেই ‘কামুকতা’ বলে—এই ছিল আমার সেই সময়ের ধারণা।

তাকে উৎসাহ দেওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া, প্রশংসা করা, আনন্দে রাখা এসবেই আমার বেশী ঝোঁক ছিল,—এক কথায় তার প্রতি আমার আকর্ষণ হয়ে পড়েছিল অনেকটা মাতৃশ্রেণীয়, অথচ এ ভাবটা কোথা থেকে আমদানী করেছিলাম বলতে পারি না।

শিল্পজীবন সম্পর্কে সে আমাকে যা বলত বন্ধুদের কাছে গর্ব্ব করে

সে-সব কথার একটু আধটু আভাষ দিতাম; তাদের বলতাম যে আমার জন্তেই সে তার লাম্পট্য-জীবন ছেড়েছে। তার যেসব কবিতা সে আমাকে উৎসর্গ করত সেগুলো বন্ধুদের পড়িয়ে শুনাতাম। এই ত সেদিনও তার একটা কবিতা হঠাৎ আমার হাতে পড়েছিল—"মেঘলা আকাশ তলে হায়, আমি হেথা একা।" কবিতাটা পড়ে আমার স্বামী বললেন, "হ্যাঁ, এর ভেতর জিনিষ আছে বটে।" আমার মেয়ে কিন্তু হেসেই খুন, বলল, "ওঃ! করুণ হবার কি ব্যর্থ প্রয়াস!" ওর এই উক্তির পরে আমি কবিতাটা পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। ফন্টেন সম্বন্ধে এই শ্রেণীর সমালোচনা শুনলে এখনও কোথায় যেন বিঁধছে মনে হয়।

আমাকে বেডা একদিনও পিয়ানো বাজিয়ে শোনায় নি, এ নিয়ে প্রায়ই সে দুঃখ করত। একটা বিশেষ রচনার কথা প্রায়ই সে আমাকে বলত, সে তার নাম দিয়েছিল—'এরিয়েল'। সে বলত, তার গান না শুনলে তাকে আমি প্রকৃত জানতে পারব না, তাছাড়া আমি সামনে থাকলে তার প্রেরণাও নাকি যাবে বেড়ে। কিন্তু হায়, কোনক্রমেই গানের ব্যবস্থা হচ্ছিল না।

একদিন আমি সাহস করে বলে ফেললাম, "বেডা, তোমার বাড়ীতে আমি তোমার গান শুনব, লোকে আর এমন কি বলবে।" থতমত খেয়ে সে জানিয়ে দিল যে তা কিছুতেই সম্ভব নয়, কারণ পিসিমা তাহলে কি মনে করবে? কিন্তু তার শিল্পপ্রতিভা আমাকে না দেখিয়ে সেও তৃপ্তি পাচ্ছিল না।

অবশেষে একদিন সুযোগ এল; আমার বাবা ও মা [illegible]দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, আমিও চট করে মতলব এঁটে ফেললাম। ফন্টেনকে বললাম, "বেডা, কাল বিকেলে আমাদের বাড়ীতে এস, তোমার 'এরিয়েল' শুনব।"

ভেবেছিলাম, এ প্রস্তাবে সে খুব আনন্দিত হবে, কিন্তু দেখলাম ভয়ে সে লাল হয়ে উঠল। সবাই এতে অনেক কিছু সন্দেহ ক'রবে, অতএব সে

যাবে না,—আমাকে সে তা জানিয়ে দিল। কিন্তু আজকাল কি সহজেই না এ সবের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। আজকাল ঘরে ঢুকেই হয়ত দেখি অপরিচিত কোন যুবককে; আমার মেয়ে সহজভাবে তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়, দু'একটা কথা বলেই আমি সরে পড়ি; ছেলেটি কে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানতে চাই না। বিশ বছরে কি পরিবর্তনই না হয়েছে!

আমি জোর করে বললাম, "কেউ কিছু মনে করবে না; মোট কথা আমি তোমার 'এরিয়েল' শুনতে চাই-ই।"

বাড়ীতে এসে ঝি-কে জানিয়ে দিলাম যে কাল বিকেলে এক ভদ্রলোক আমাদের পিয়ানোটা পরীক্ষা করতে এখানে আসছেন।

ঝি-টাকে ভয় করছিলাম, যদি ও মাকে বলে দেয়। পরের দিন বিকেলে ভয়টা আরও বেড়ে গেল, ভাবলাম, খুব অন্যায় করেছি বেডাকে নিমন্ত্রণ করে। এদিকে দেখলাম, সাজগোজ করে ঝি বেরিয়ে যাবার উপক্রম করছে, জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যাচ্ছ আংকা?"

বিশ্রী দাতগুলো বের করে আংকা উত্তর করল, "বেড়াতে যাচ্ছি। সবাই বাইরে, আমিই বা একলা ঘরে খেটে মরব কেন?—গটগট্‌ ক'রে বেরিয়ে গেল।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল, কিন্তু করবার কিছু নেই। ভীষণ একাকী বোধ করছিলাম, কিছুক্ষণ পরেই আবার বেডা এসে পড়বে, বুকটা দুরদুর করতে লাগল।···দূর ছাই! ঘাবড়াচ্ছি কেন?" নিজের ওপর ক্ষেপে গেলাম।

বাইরের ঘণ্টা বাজল, দরজা খুলে দেখলাম, সিঁড়ির পাশে বেডা চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে।

—"এই যে।···এস!"—অনেক কষ্টে বলে ফেললাম; গলা আমার আটকে আসছিল, ভয়ে রাগে লাল হয়ে যাচ্ছিলাম।

বেডার অবস্থাও আমারই মত। "হ্যাঁ···আমি"—থতমত খেয়ে বলে

পা টিপে টিপে দরজা পেরিয়ে এল। নিজেকে সামলে নিয়ে পাকা গৃহিণীর মত তাকে অভ্যর্থনা করতে প্রবৃত্ত হলাম। এই গৃহিণীপনাটা যে কোথা থেকে আমি রপ্ত করেছিলাম জানি না। কে জানে, হয়ত এটা নারী জাতির জন্মগত ধর্ম্ম।

"এরিয়েল কিন্তু আমি এখন শুনতে চাই।"—আমি বললাম। বেডা মৃদুস্বরে বলল, "তুমি এখানে একা জিংকা?"

—"হ্যাঁ,"—আমি সহজভাবে বললাম, "আর দেরী করো না বেডা, ঐ যে পিয়ানো।"

বেডা পিয়ানোর সামনে টুলে বসে দুহাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে পিয়ানোতে অন্যমনস্ক ভাবে হাত চালাতে লাগল। "এরিয়েল!" সে বলল, "এরিয়েল আমার প্রাণ, আমার শিল্পীমনের পূর্ণ বিকাশ।······তোমাকে দেখবার পর থেকে জিংকা, আমার মনের সমস্ত মলিনতা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।" আঙ্গুলগুলো একটু সংযত করে চালাতে চালাতে বলল, "এই, আরম্ভ হচ্ছে।" জোরে হাত ছুঁড়তে লাগল, একটু পরে মুখ বিকৃত করে বলল, "না:! এটা ঠিক বাজছে না!······আচ্ছা, তোমাকে চপিনের 'নক্‌টার্‌নো' বাজিয়ে শোনাচ্ছি।"

—"কেন, এরিয়েলের কি হ'ল?"

—"আজ নয়, আর একদিন।"—আবার হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দিল, —"আজ তুমি আমার কত কাছে, আজ আমি ভাবছি শুধু তোমার কথা। বল্‌তে পার জিংকা, তোমাকে দেখলে কেন আমার এমন হয়?"

আমার সজ্ঞা অনুযায়ী 'কামুকতা' তাকে ভর করবার উপক্রম করেছে বুঝতে বাকী রইল না। অভদ্রভাবে বলে উঠলাম, "বাজাও বেডা, যা খুসি বাজাও।"

বেডা টুল থেকে উঠে দাঁড়াল, হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, "জিংকা! তুমি আমাকে ভালবাস? বল?"

বেডার থুতনিটা কাঁপছিল, মুখ লাল হ'য়ে উঠল। ওকে আমি ভালবাসতাম সত্যি, কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে উঠল; আর এক পা এগুলে হয়ত ওর গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করতাম না।

আমার মনের অবস্থা বেডা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল, আর এগুতে সাহস পেল না; তার চোখমুখের ভাব দেখে মনে হল সে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে। দেখে আমার মন ভিজে গেল, বড় কষ্ট হ'ল, কিন্তু নতুন কিছু ঘটবার আগেই বেডা অভিমানের সুরে বলল, "ওঃ, বড্ড বড়লোকি চাল তোমার।" জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কি যে করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টে বললাম, "তুমি বাড়ী যাও বেডা! যাও!!"

বেডা ফিরে তাকাল, চোখে তার জল। আমারও চোখ জলে ভরে গেছে, কোন মতে গলা চেপে বললাম, "যাও তুমি!" আর চাপতে পারলাম না, জোরে কেঁদে উঠলাম। লজ্জায়, রাগে, দুঃখে কান্না আমার উপছে উঠল। ততক্ষণে বেডা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার কাছে এক লম্বা চিঠি লিখব ভেবেছিলাম। হয়ত প্রথমে খানিকটা গালমন্দ করে, পরে ক্ষমা করে চিঠিটা লিখতাম—সম্পূর্ণ মেয়েলি প্যাচে। কিন্তু লিখবার আগেই আমি আর ম্যানিয়া একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম দূর থেকে বেডা আসছে। সে আমার কেউ নয় এমনি ভাব দেখিয়ে চলতে লাগলাম, অথচ বুকটা যে আমার কাঁপছিল তা বেশ অনুভব করছিলাম। আমাকে পাশ কাটিয়ে বেডা চলে গেল, যেন সে আমাকে খেয়ালই করে নি।

ম্যানিয়া অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁরে, তোরা কথা বন্ধ করেছিস!"

—"ও একটা পশু, ছোটলোক!" আমি জোর গলায় বললাম।

এইখানেই আমাদের সমস্ত সম্পর্কের অবসান হয়। এই ঘটনার পরে

এলিস্কার কাছে সে একদিন আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল যে আমি নাকি বড্ড বুর্জ্জুয়া ভাবাপন্ন। কথাটা আমার কানে আসতে আমি খুব ক্ষেপে গিয়েছিলাম, কিন্তু আর কোন বাড়াবাড়ি হয় নি।

ফন্টেনের চেয়ে আমার কথাই হয়ত আমি বেশী বলে ফেললাম। উপায় নেই, যৌবনে অন্তের চেয়ে নিজের বিষয়েই মানুষ বেশী মনযোগী হ'য়ে পড়ে। বাইরের লোকের সঙ্গে তাদের পরিচয় করবার প্রয়োজন হয় শুধু নিজেদের ঘটনাগুলো সমৃদ্ধ করবার জন্য। এই কারণেই যৌবনে বন্ধু-নির্ব্বাচন খুব যুক্তিসম্মত হয় না, কতগুলো সুযোগ-সুবিধের ওপর নির্ভর করতে হয়। সেদিক থেকে ফন্টেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও অর্থহীন। তার শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে আমার পার্থিব মনের খাপ একেবারেই খায় নি।

সে ঠিকই বলেছিল,—আমি বুর্জ্জুয়া ভাবাপন্ন। এই মন্তব্যে আমি এখন সুখী বই অসুখী নই; তবু একথা বলাতে আমি যে এক সময় চটে যেতাম তা মনে করে এখন হাসি পায়। আমার মেয়ে তার সম্বন্ধে বলে, "লোকটা ভয়ানক কামুক"। ওর এই উক্তি আমার ভাল লাগে না। ফন্টেন উচ্ছ্বসিত হয়ে যেভাবে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে সোহাগ করতে চাইত সেকথা মনে করে এখন বেশ বুঝতে পারি। এসব বিষয়ে সে ছিল তখন সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, আমার চেয়েও আনাড়ি। সে লম্পট, চরিত্রহীন—এসব কথা বলে আমাকে তাক লাগিয়ে দেওয়াই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ যুগের ছেলে হলে সে হয়ত বলত, সে একটা গোপন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, অথবা মোটর চালিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিশ বছর আগে দেশের হাওয়া ছিল শিল্পের দিকে। সময় গড়িয়ে যায়, দেশের হাওয়াও যায় বদলে; অথচ যৌবনের ফাঁপা উচ্ছ্বাসের বিন্দুমাত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় না, যুবক-যুবতীতে এই রোগ সংক্রামিত হবেই।

[শ্রীমতী জিৎকা হুডকোভার ডায়েরী]

বেডরিথ ফন্টিন সম্বন্ধে আমার অভিমতটা একটু একতরফা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরিচয়ের প্রথম দিনেই তাকে আমি কুনজরে দেখেছিলাম। তখন আমি রসায়ন শাস্ত্রের চতুর্থ বর্ষিক শ্রেণীতে পড়তাম। ছুটির পরে সবেমাত্র ফিরে এসেছি, বাড়ীউলি জানিয়ে দিল আমার ঘরে এখন থেকে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছেলে আমার সঙ্গে থাকবে। ছেলেটির সঙ্গে একটি পিয়ানোও নাকি আছে। একে ঘরটা খুব ছোট, তার ওপর যখন গিয়ে দেখলাম ভাঙ্গা পিয়ানোটা ওখানে স্থান পেয়েছে, তখন মেজাজ চড়ে গেল। ফন্টিন যেচেই আমার সঙ্গে আলাপ করল। আকৃষ্ট হবার মত চেহারা বটে। জানলাম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন পড়তে সে এখানে এসেছে, তবে সঙ্গীতের গবেষণা করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। সে আমাকে আরো জানিয়ে দিল যে বর্ত্তমানে 'এরিয়েল' নামক একটি গানে সুর-যোজনায় সে ব্যস্ত আছে।

সঙ্গীত শাস্ত্রে সামান্য অধিকার আমার ছিল। সে আমার সঙ্গে গান সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাইত। বুঝলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে সে বিষয়ে সে তেমন সজাগ নয়। তাই কৌশলে তাকে তা বুঝিয়ে দিলাম। সে কিন্তু তার পর থেকে তার প্রতিভা দ্বারা আমাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। কোনদিন হয়ত সমস্ত রাত্রি বাইরে কাটিয়ে ভোর চারটায় বাড়ী ফিরত; অকারণ চেয়ার-টেবিলগুলো লাথি মেরে ফেলে দিত, হয়ত বা অসময়ে পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করত। মাঝে মাঝে সে আর্ট সম্বন্ধে অনর্গল বকে যেত। কতকগুলি বড় বড় কথা সে আয়ত্ত করেছিল, যেমন—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, মনের অবচেতন অবস্থা, স্বর্গীয় অনুভূতি ইত্যাদি। কথায় কথায় এগুলো সে আওড়াত। ফন্টিনই যে শুধু এই দোষে দোষী

তা নয়, এটা এযুগের একটা বিশেষ রকমের রোগ। ধোঁয়াটে কথা দিয়ে বড় বড় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করি, অথচ হৃদয়ে অনুভব করি না ছিটে-ফোঁটাও। সত্যি, এই গালভরা কথাগুলো উঠিয়ে দিলে এই সব শূন্য কুম্ভের মালিকদের কি বিপদেই না পড়তে হোত।

সে বলত, রতিজ্ঞ জীবন থেকেই শিল্পের উদ্ভব। শিল্প কামজীবনের বাহ্যিক প্রকাশ। আমি চটে গিয়ে বলতাম, এ অবস্থায় তার শিল্পের এহেন প্রকাশ না হলেই দেশের মঙ্গল হবে। সে বলত, ওখানেই আমি নাকি মস্ত ভুল করছি। কামপাত্রকে নিজের রূপ দেখানই হচ্ছে নাকি শিল্পের উদ্দেশ্য। তার মতে শিল্পীরা হচ্ছে ঘোর স্বার্থপর, অহং-পূজারী; —তবে এই স্বার্থপরতা, এই অহংবাদের ভেতর স্বর্গীয় ভাব বিদ্যমান। অসহিষ্ণু হয়ে আমি বলতাম "তোমার ঐ শূয়োরের মত ঝাঁকড়া চুলগুলো, —তাও কি তোমার অহংবাদের প্রকাশ ?" আমার কথায় সে খুব অপমান বোধ করত। এক কথায় তার সঙ্গে আমার মোটেই বনত না।

মেয়েদের পটিয়েছে বলে গর্ব্ব করে বেড়ায়, 'ডনজুয়ান' শ্রেণীয় সেই যুবকদের আমি বরদাস্ত করতে পারি না। অসহ্য হয়ে উঠি, যখন দেখি নির্লজ্জ বেহায়ার মত তারা প্রকাশ্যে তাদের বীরত্বের কথা বলে যায়, এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। ফল্‌টিন ছিল এদেরই একজন, মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে কত প্রেমের গল্প বলে যেত। রাস্তায় হয়ত কেউ তাকে কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে, বাড়ীতে এসে সেই লোকটির কাছে সেই মেয়ের সম্বন্ধে এমনি করে সাজিয়ে গল্প বলত, কে বলবে ওর ভেতরে মিথ্যা বিন্দুমাত্র আছে!

প্রত্যেক নাচের আসরে তার যাওয়া চাই-ই। সেখানে বড়লোকদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তার বেগ পেতে হত না। কোথায় যে সে এত টাকা পেত তা আজ পর্য্যন্ত জানতে পারিনি। অবস্থা তার খুবই খারাপ ছিল, সময় সময় খাওয়ার পয়সাও জুটত না; কিন্তু পোষাকটি

ছিল তার পরিপাটি। এসব দেখে এখন আমার মনে হয় টাকা ধার করতে সে বেশ সিদ্ধহস্ত ছিল। বড়লোকদের সঙ্গে মেশবার তার বিপুল আগ্রহ দেখতে পেতাম। বাড়ীতে কিন্তু সে চলত সম্পূর্ণ অন্য ধরনে—যাযাবরের মত। শিল্প ছাড়া আর সব কিছুকেই সে ঘৃণার চোখে দেখত—টাকাকে ত নিশ্চয়ই। মাঝে মাঝে সে আমাকে তার কোন এক বিশেষ প্রণয়িনী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে চলত। অথচ সে মেয়ে যে তার মত এক ডেঁপো ছোঁড়ার প্রেমে পড়তে পারে না তা আমি স্থির জানতাম। একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বলে ফেললাম, "আঃ! চুপ কর ফন্টেন; কোন মেয়েই যে তোমার দিকে তাকায় না তা আমার অজানা নেই; বানিয়ে বানিয়ে কি সব অদ্ভুত গল্পই না বলতে পার তুমি?" ফন্‌টেন কাঁদকাঁদ হয়ে উঠল, কিন্তু কি করব? তার সম্বন্ধে আমার অভিমত তাকে জানিয়ে অনেকটা সোয়াস্তি পেলাম।

এর পর থেকে সে আমাকে শত্রুভাবে দেখতে লাগল, অবশ্য মুখে কিছু বলত না। গুমট আবহাওয়ার ভেতরে দিন কাটাতে কাটাতে আমরা দুজনেই হাঁপিয়ে উঠলাম। অবশেষে একদিন এই একঘেয়ে অবস্থার অবসান ঘটল।

ঘটনাটি এই—আমার এক বান্ধবী ছিল, আমার সহপাঠিনী, নাম পাভলা। ধীর, স্থির, শান্ত মেয়ে। ঘটনাক্রমে ক্লাসে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ক্লাস ছুটি হলে আমরা দুজনে এক সঙ্গে বেড়াতে যেতাম। পাভলার সঙ্গ আমাকে খুব আনন্দ দিত, বেশ ফূর্তিবাজ মেয়েটি। অবশ্য আমাদের মেলামেশার ভেতরে প্রেমের কোন ইঙ্গিত ছিল না। সে পড়ত উদ্ভিদ শাস্ত্র আর আমি রসায়ন, তবু মাঝে মাঝে আমাদের ভেতরে বইয়ের আদানপ্রদান হোত।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কতকগুলো বই ফিরিয়ে দিতে পাভলা আমার বাড়ীতে গিয়েছিল, আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম না; ফন্টিনের কাছে বইগুলো

রেখে যায়। সেইদিনই আবার পাভলার সঙ্গে আমার অন্য এক জায়গায় দেখা। আমার বাড়ীতে সে যে গিয়েছিল তা আমাকে জানিয়ে দিল, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা, তোমার ঐ গায়ক বন্ধুটি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির, নয় কি ?"

প্রমাদ গনলাম, "কেন, কিছু হয়েছে নাকি ? তোমাকে ও নিশ্চয়ই বিরক্ত করেছে।"

—"না!" আশ্চর্য্য হয়ে সে বলল, "আচ্ছা, সত্যি কি সে একজন উঁচুদরের শিল্পী ?"

কথাটা আমার ভাল লাগল না, একটা কিছু নির্ঘাত ঘটেছে। আগ্রহের সঙ্গে বললাম, "বুঝেছি। নিশ্চয়ই ও তোমার কাছে বড় রকমের বক্তৃতা করেছে, তাই না ? শিল্পে কামের প্রভাবের কথা বলেনি ? স্বর্গীয় অনুভূতির কথা ? মনের অবচেতন অবস্থা ?"

"তার মানে ! "—কটুস্বরে সে জিজ্ঞাসা করল। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম "তার মানে, তার অভিসন্ধি ভাল নয়—তবে হ্যাঁ, তোমাকে স্পর্শ করলে তাকে আমি মেরে ফেলতাম না ?"—হায় রে ঈর্ষা !

আমার ওপর পাভলা যে বিরক্ত হয়েছে তা বুঝতে আমার বাকী রইল না, ব্যাঙ্গ করে বলল "ধন্যবাদ ! আমাকে রক্ষা করবার জন্যে অন্য কাউকে আমি ডাকব না।"

আমাদের ভিতরে কিছু কথা কাটাকাটি হল।

ভীষণ চটে গেলাম ফন্টিনের ওপর। ঘরে ঢুকেই বললাম "এই যে ফন্টেন, পাভলা এসেছিল ?"

আমার আগমনে গানবাজনা বন্ধ হল না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল'ল, "হ্যাঁ এসেছিল।" আবার বাজিয়ে চলল খেয়ালীমনে।

—"তোমাকে কিছু বলে গিয়েছে ?"

—"না, তেমন কিছু নয়"—হঠাৎ সে ওয়ালট্জ্ বাজাতে আরম্ভ করল।

অসহ্য লাগল, মনে হল ফন্টিন যেন আমার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। ওঃ! কি বিকৃত সুর!

"কি বলছ তুমি?" রাগে চীৎকার করে উঠলাম।

—"ডি···ডা··· ট্য···ডা"—ফন্টিনের মুখ দিয়ে বেরুল, পিয়ানো জোরে বেজে উঠল। অন্ধকারে নিজেকে সামলাতে পারব না আশঙ্কা করে আলো জাললাম। আমার প্রতি কটাক্ষ হেনে ফন্টিন নিজেকে পুনরায় গানের ভেতরে ডুবিয়ে দিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কসরৎ চলতে লাগল। এইভাবে পাভলাকে উপেক্ষা করবার মিথ্যা ভান করে সে যে আমার ওপর প্রতিহিংসা নিচ্ছিল তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তার ঐ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত আহত হয়েছিলাম। দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করবার ইচ্ছাও হয়েছিল প্রবল, কিন্তু ওর কি দোষ!—বিকৃত সুরে ওয়ালট্জ্ বাজাচ্ছে বলেই ত আমি তার দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারি না।

"ছোট লোক"—বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। যাবার মুখে ফিরে দেখলাম অর্দ্ধনিমীলিত চোখে ফন্টিন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে, যেন বলছে, "কেমন জব্দ!"

পরের দিনই ভিন্ন ঘরে উঠে গেলাম। ঐ ঘটনার কথা পাভলাকে কিছু জানাই নি। আমাদের বন্ধুত্বে প্রেমের কো ইঙ্গিত ছিল না একথা তখন আর জোর গলায় বলতে পারতাম না। কিন্তু তাও ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল।

একদিন নদীর পারে দুজনে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ ফন্টিনের ওয়ালট্জের কথা মনে পড়ে গেল, চাপতে পারলাম না, বোকার মত পাভলাকে বলে ফেললাম। সেদিনই আমাদের বন্ধুত্বের অবসান হোল।

আমার বিশ্বাস, ফন্টিনের গানের প্রতিভা কিছু ছিল, তাই যদি না

হবে, তবে গানের ভেতর দিয়ে একজনকে এভাবে জব্দ করা কি করে সম্ভব!

কিছুদিন পরে শুনলাম, পাশ করবার আগেই নাকি বিশেষ অবস্থাপন্ন এক ভদ্রঘরের মেয়েকে সে বিয়ে করে বসেছে। শুনে একটুও বিস্মিত হইনি।

[ডাঃ 'ভি বি'র ডায়েরী]

[৪]

আমার স্বর্গত স্বামীর সঙ্গে এক নাচের আসরে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তখন আমার মাত্র বিশ বছর বয়স, এতদিন ঘরের কোনে ছিলাম, সত্ত বাইরে আনাগোনা করছি। সে-সময় মেয়েদের ঘরের কাজ নিয়েই পড়ে থাকতে হ'ত, বাইরের জ্ঞান আহরণে তাদের কোন অধিকার ছিল না। জন কয়েক 'মা' হয়ত তাঁদের মেয়েদের 'আধুনিকা' সাজাতেন ভালছেলেদের ফাঁদে ফেলবার জন্যে। আর তখনকার মেয়েদের ছিল এই ধরণ,—যে-কোন ছেলে প্রেম নিবেদন করলেই তাকে গ্রহণ করে নিত,—ভাববার অবসর পেত না, জানবারও সময় ছিল না, তার আগেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'ত। তবু সে বিবাহ আজকালকার মত এত ঠুনকো ছিল না।

প্রথম দেখেই ফন্টেনকে আমার মনে ধরেছিল। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, উঁচু কপাল, কাঁচা রং, শান্তশিষ্ট ভদ্র চেহারা—তার ওপর এক চোখে চশমা আঁটা—সব মিলিয়ে ঠিক শিল্পীর মতই দেখাচ্ছিল তাকে। লক্ষ্য করছিলাম, অনেকক্ষণ ধরে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মা তার ওপর খুব আকৃষ্ট হলেন, তাকে আমাদের বাড়ীতে আসতে অনুরোধ করে বসলেন। মা কিন্তু মস্ত একটা ভুল করে ফেললেন,—তিনি ভেবেছিলেন ম্যালা স্ট্রানার বিখ্যাত ফন্টেন বংশের ছেলে সে। কিন্তু মা যখন তাঁর ভুল জানতে পারলেন তখন তাকে হটিয়ে দেবার আর উপায় ছিল না, কারণ তখন আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। মনের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল যে আমাদের মিলনে কেউ বাধা দিলে নদীতে ঝাঁপ দিতেও ইতস্তত: করতাম না।

বাবা কিন্তু ফন্টেনকে পছন্দ করলেন না। মা অবশ্য বললেন, "মন্দ কি! ছেলে আইন পড়ছে, আমাদেরও পাঁচপাঁচটা বাড়ী রয়েছে, বাড়ীগুলো

সম্বন্ধে ওর কাছ থেকে উপদেশ তো যথেষ্ট পাব।" নিরুপায় হয়ে বাবা তখন ভাবলেন, অন্ততঃ পরীক্ষায় পাশ করাটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। কিন্তু যখন তারা দেখলেন দেরী আমার সইছে না, আর দিনদিন শরীরও পড়ছে ভেঙ্গে, তখনই তাড়াহুড়ো করে বিয়ের ব্যবস্থা করা হ'ল।

কেন ফন্টেনের প্রেমে পড়লাম এ প্রশ্ন নিজেকে বহুবার করেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি,—কেউ পায়ও না। সে ছিল শিল্পী, সুরকার; জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কিছুরই তার অভাব ছিল না; হয়ত তার এসব গুণেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম,—কিন্তু তার কোমলতা, দুর্ব্বলতা আমাকে আরো আকৃষ্ট করেছিল। আমি স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ ছিলাম, বোকাও ছিলাম খুব; কিন্তু ওর মনটা ছিল আমার চেয়েও দুর্ব্বল। ওকে দেখাশুনা করবার জন্যেও তো একজন দরকার।

লোকে ভাবত ফন্টেন বড় অহঙ্কারী, দাম্ভিক; কিন্তু বস্তুতঃ সে ছিল লাজুক, দয়ার পাত্র; আমাকে সে শারলোটা বলে ডাকত; আমিও কারলার চেয়ে ঐ নামটাই বেশী পছন্দ করতাম। সে বলত, "তোমাকে কাছে পেয়ে আমি আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি শারলোটা; তুমি ধীর, স্থির।"

মাটির মানুষ ছিল ফন্টেন, আর তার সেই সরল মনের সুবিধে নিয়ে বন্ধুরা তার সর্ব্বনাশ করত। আমরা দুজন হাতে হাত রেখে শিশুর মত তাকিয়ে থাকতাম দুজনের দিকে, আর তারই মাঝে ফন্টেন মৃত্যু সম্বন্ধে কত বিশ্রী কথাই না বলত। একে ত আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তার উপর মৃত্যুর কথা! আমি ফেকাশে হয়ে যেতাম। সত্যি, একটা সময় আসে যখন তরুণী মাত্রেই মরবার আকাঙ্ক্ষা করে বড় আনন্দ পায়। ফন্টেন বলত, আমাকে দেখতে নাকি সাদা গোলাপের মত। তার কথাটা আমার খুব ভাল লাগত; লুকিয়ে লুকিয়ে ভিনেগার খেতাম আরও ফেকাশে হব এই আশায়। মাঝে মাঝে তার কাশি হ'ত, বিকেলের দিকে হাতদুটোও বেশ গরম বোধ হ'ত। ভাবতাম, ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়ত হয় নি। পরে

জানতাম যে আমাকে উপহার দেওয়ার জন্যে সাদা গোলাপের খোঁজে সমস্ত দিন সে টো টো করে ঘুরেছে, খাওয়ার অবসর পায়নি। এমনিভাবে আমরা দুজন দুজনকে কাছে টেনে আনছিলাম।

বিয়ের পরে ফন্টেন কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ একেবারেই তুলত না, যেন জীবনের ঐ অধ্যায়টি শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন আমরা ছ'টা ঘরওয়ালা এক সুন্দর ফ্ল্যাটে উঠে এলাম। বাবা মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে আসতেন। ফন্টেন প্রায় সমস্ত সময়েই জমকালো পোষাকে বাড়ীর ভেতর ঘুরে বেড়াত। ঐ বেশে তাকে চমৎকার মানাত কিন্তু। লক্ষ্য করলাম, বিষয়আসয় ব্যাপারে সে দস্তুরমত এক রুচি আয়ত্ত করে বসেছে; যাতে একটা কাণাকড়িও বাজে খরচ না হয় সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। বিশেষ আশঙ্কিত হলাম, লোকটা আবার কৃপণ না হয়ে পড়ে। আমার আত্মীয়স্বজনেরা কিন্তু এতে খুশীই হ'ল, বলল, "ধনীমাত্রেই মিতব্যয়ী হয়ে থাকে।"

ফন্টেন আইন পরীক্ষায় পাশ করুক আত্মীয়স্বজন সবাই তা চাইত। কিন্তু সেবার আমাদের মধুচন্দ্রিকার বছর ব'লে কেউ পড়বার কথা মুখেও আনল না, সে সম্বন্ধে যতটুকু কথা হত তা শুধু ফন্টেনের তরফ থেকেই। সে বলল, তার শরীরটা খুব খারাপ, শরীর ভাল না হ'লে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর শরীরের প্রতিও তার সে কি যত্ন! দেখলে অবাক হতে হয়। একটা কাসি অথবা হাঁচি দিয়েছে কি অমনি বিছানায় এলিয়ে পড়ত, আর আমরা তার সেবাকার্যে লেগে যেতাম—যেন সে কচি শিশু।

গানের প্রতি তার অনুরাগটাও যেন কমে যাচ্ছিল দেখা গেল, অবশ্য মাঝে মাঝে যে সে পিয়ানো না বাজাতো এমন নয়। সে বলত যে কোন ওস্তাদ রেখে তার হাত পাকা করতে হবে। মেজাজ ভাল থাকলে সে মাঝে মাঝে আমাদের বাজিয়ে শোনাত। আমার বুড়ো বাবা তার গানের প্রশংসা করতেন, গান শুনে আনন্দও পেতেন প্রচুর। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে যখন

বাজাতে থাকত তখন তাকে আমার বড় ভাল লাগত, মনে মনে বেশ গর্ব্ব অনুভব করতাম। আর বাবা যখন তার গান এতই পছন্দ করেছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি তার পড়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন না; ভেবে অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। সত্যি তার পড়বার প্রয়োজনটাই বা কি? সে যে শিল্পী।

তারপর, গান শেষ করে চুলের গুচ্ছে হাত চালিয়ে দিয়ে যখন সে উঠে দাঁড়াত তখন যে আমার কি আনন্দ হ'ত তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।...... মাঝে মাঝে সমস্ত দরজাজানালা বন্ধ করে দিয়ে ফন্টেন ঘরের ভিতর আটক থাকত, তখন ঘরে প্রবেশ করা আমাদের নিষেধ ছিল, কারণ তা হলে তার গান রচনায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটবে। বাড়ীতে টু শব্দটি করবার জো ছিল না, সবাই অতি সাবধানে চলাফেরা করত। একদিন আমি হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে দেখি হাত দুটো পেছনে রেখে দিব্যি আরামে সে কৌচে শুয়ে আছে। সে তো রেগেই আগুন, তার সৃষ্টি-সাধনার ওপর নাকি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। টুপিটা তুলে নিয়ে গট্‌গট্ করে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। এরপর থেকে শিল্পসম্পর্কীয় যে কোন ব্যাপারেই সে যখন ডুবে থাকত কেউ তখন তাকে বিরক্ত করত না।

নিরুপায় হয়ে অবশেষে একদিন বাবা ফন্টেনকে প্রকারান্তরে কয়েকবার প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে সোজাসুজি জানতে চাইলেন যে কবে সে পরীক্ষা দেবে মনস্থ করেছে। বেড্‌রিথ্ ফেকাশে হয়ে গেল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখুন, বিষয়টা পরিষ্কার ক'রে ফেলাই ভাল; শিল্পের ভেতরই নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করব ঠিক করেছি। আমার এই পথ আপনার মনঃপূত হবে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু এর অন্যথাও আমাকে দিয়ে হবে না।"—টুপিটা হাতে ক'রে সে চলে গেল।

বাবা তো চেঁচিয়ে মেচিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন, বললেন, শিল্পে পেট ভরে না। তাছাড়া জামাইকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবেন এমন বোকাও তিনি নন। আমি কেঁদে ফেললাম; মা আমার স্বামীর পক্ষে ওকালতি করলেন। এসব গণ্ডগোলে আমার বিবাহিত জীবনের অশান্তি যে বাড়বে মা তা বাবাকে

বুঝিয়ে দিলেন, আর বললেন যে শিল্পে পেট না ভরলেও এ অতি সম্মানজনক কাজ এবং হয়ত একদিন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাও ওর ভাগ্যে জুটে যাওয়া অসম্ভব নয়। বাবা অপ্রসন্ন হলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে মনে আনন্দও পেলেন এই ভেবে যে তাঁর টাকা দিয়ে একজন শিল্পসাধনা করছে। এই সময় কোন্ এক দেশের রাজকুমারী কোথাকার এক গায়কের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এই সংবাদে সমগ্র গায়ককুলের বিরুদ্ধে নিন্দাও যেমন ছড়িয়েছে তেমনি যশও তাদের কম হয়নি। মোটকথা, আমার বাবা হচ্ছেন এক শিল্পীর শ্বশুর—এটা মনে ক'রে তাঁর রাগ অনেকটা পড়ে গেল।······সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে আর কোন কথা উঠল না, তবে ফন্টেন জানিয়ে দিল যে সে এক ভিন্ন জগতের মানুষ, আমাদের সঙ্গে তার খাপ খাওয়ানো একেবারেই অসম্ভব।

এরপর থেকে লোকেরা ফন্টেনকে শিল্পাচার্য্য আখ্যা দিল, তাকে শিল্পাচার্য্য বেডা ফন্টেন বলে ডাকতে আরম্ভ করল। অবশ্য এই নামে ডাকবার ব্যবস্থা আমার স্বামী নিজেই করেছিল। সে হচ্ছে শিল্পাচার্য্য ফন্টেন আর আমি শ্রীমতী ফন্টিনোভা,—যেন আমি তার স্ত্রী নই। এই নতুন নাম ধারণ করবার পর থেকেই সে বিভিন্ন গায়ক ও সাহিত্যিকদের আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করত, সপ্তাহে দু এক দিন গানের ব্যবস্থাও হ'ত। তরুণী গৃহিণীর পক্ষে কিন্তু এসবের ব্যবস্থা করা অতি কষ্টসাধ্য হয়ে উঠত। ফন্টেন ফিট্‌ফাট্ পোষাকে তাদের অভ্যর্থনা করত; তাদের সামনে তাকে আমার বেডা বলে ডাকতে হ'ত আর সে আমাকে ডাকত শ্রীমতী ফন্টিনোভা ব'লে; এই নিয়মই নাকি শিক্ষিত মহলে চলতি।

বিশেষ পেড়াপিড়ি করাতে বৈঠকে ফন্টেনকেও মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজাতে হ'ত, অবশ্য নিজের রচনা নয়। সময় সময় তরুণ গায়কদের প্রথম রচনা এখানে অনুষ্ঠিত হ'ত, সবাই সেই সব অনুষ্ঠানকে 'ফন্টেনের বাড়ীতে প্রথম রজনী' ব'লে অভিহিত করত। এই শান্তশিষ্ট শিল্পীদের অভ্যর্থনা করতে টাকা পয়সা বড্ড খরচ হ'ত। কেউ কেউ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকত,

ওঠবার নামটি পর্য্যন্ত করত না। সিগারেটের ছাই ও ধোঁয়ায় ঘর ভরে উঠত, সমস্ত সরঞ্জাম লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত,—ঘরের দিকে তাকাতে পারতাম না। ফন্টেনের কাছে অভিযোগ করলে সে বলত, "ভিন্ন মাপকাঠি দিয়ে শিল্পীদের বিচার ক'রো।"—ওদের ঐ উঁচুদরের আলোচনায় আমি নিজেকে তাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারতাম না, শোবার ঘরে চলে যেতাম। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাশের ঘরে হৈ চৈ চলতে থাকত। আমি ভাবতাম, এই সমস্ত জটিল আলোচনায় ডুবে থাকতে সে বোধ হয় ভালবাসে।

এই সময় আমার বাবা সন্ন্যাসরোগে মারা যান। তিনি মারা যাবার পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত আর আমাদের বাড়ীতে সান্ধ্যবৈঠকের অনুষ্ঠান হ'ল না। এতে ফন্টেনের খুব অসুবিধে হ'ল, কিন্তু চুপ করে বসে রইল না। সে তখন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আসর জমাবার জন্যে বাইরে কোথাও ব্যবস্থা করল। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সত্যি কথা বলতে কি এই শিল্পীদের আমার মোটেই ভাল লাগত না। ফন্টেন আমাকে বলত যে সে তাদের সঙ্গে একটা বিশেষ গবেষণায় নিযুক্ত আছে, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে সে শুধু তাদের টাকা যুগিয়ে যাচ্ছে। সময় সময় সে আমাকে বুঝিয়ে দিত যে সে এক বিরাট কিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। দিনরাত পড়বার ঘরে আটক থাকত। আমার ভয় হ'ত, হয়ত তার কাসি আবার বেড়ে যাবে। কাজের মাত্রা কমিয়ে দিতে তাকে অনুরোধ করতাম, বলতাম, এত কি দরকার? বড্ড চটে যেত সে, চীৎকার করে জানিয়ে দিত যে সৃষ্টি করা যে কি [illegible]শ্রম কাজ তা আমি কি করে বুঝব! শিল্পীকে নাকি তার সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জন দিয়ে তার সাধনার ভেতর ডুবে থাকতে হয়। তারপর, এক সপ্তাহ সে হয়ত কিছুই করত না, শুয়ে বসে দিন কাটাত; সে অবশ্য বলত যে সে মনঃসংযোগ করছে। আমি কিছুই বুঝতাম না, তবে তার হাবভাব দেখে মনে হ'ত সৃষ্টিটা যেন কেমন ধারা কাজ!

ফন্টেনের মেজাজ ক্রমেই খিটখিটে হয়ে উঠছিল,—এই নাকি তার কবি-

প্রাণের অভিব্যক্তি, অন্ততঃ সে তাই বলত। আমার কিন্তু মনে হ'ত, সে হয়ত কোন বিশেষ চিন্তায় বিব্রত হচ্ছিল। সমস্তদিন ভরে সে তার রচনা সম্বন্ধে বগবগ করে যেত, সবাইকে জানিয়ে দিল যে আগামী রচনাই নাকি হবে তার সবচাইতে বড় কীর্ত্তি। এবার সে রচনা করবে এক গীতিনাট্য—নাম দেবে যুডিথ; অবশ্য মাঝে মাঝে যুডিথের পরিবর্ত্তে এ্যাবেলার্ড আর হেলয়েসের নামও উল্লেখ করে বসত। বর্ত্তমানে সে কথা-রচনায় নিমগ্ন আছে, পরে সে তাতে সুর যোজনা করবে। ভাবগুলো বিলকুল তার মাথায় এসে জড় হয়েছে, শুধু লিখে ফেললেই হ'ল। তারপর একদিন হঠাৎ তার সব কিছু কোথায় উড়ে গেল। দিনরাত বাইরে থাকত, মাঝে মাঝে ফেকাশে মুখ, ক্ষীণ চেহারা নিয়ে বাড়ীতে দেখা দিয়ে যেত, বলত, সত্যি-কারের উচ্ছ্বাস, কাব্যজগতের মহৎ প্রেরণা এবার তার ভেতর এসেছে। কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন সে এক চিঠি রেখে উধাও হ'ল। লিখে গেল, শিল্পের সন্ধানে সে ছুটছে। আমার মনের অবস্থা যে তখন কি হ'ল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। পরের দিন শুনলাম কোন্ এক বিদেশী গায়িকার সঙ্গে সে পালিয়েছে। আমি তার নাম বলব না; আধাবয়সী সে, পালিয়ে যাবার মত চেহারা নয়, নাট্যজগতে এককালে নামডাক ছিল। কিন্তু তখন তার অখ্যাতির মাত্রা বেড়ে চলছিল এবং দর্শকবৃন্দ তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করত।

আমার চরিত্রের সবচাইতে অদ্ভুত জিনিষ হচ্ছে এই যে, আমার স্বামীর ব্যাপারে আমি কখনও ঈর্ষাপরায়ণ হইনি। প্রেমের ক্ষেত্রে আমার উদাসীনতা হেতু তা হতে পারে, অথবা এও হতে পারে যে ঈর্ষাপরায়ণ হবার মত সম্পর্ক আমাদের ভেতর জমে ওঠেনি। উপরন্তু তার এই বোকার মত পালিয়ে যাওয়াতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হ'লাম। চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেল; লোকে বলাবলি করতে লাগল, বৃদ্ধা মায়াবিনীর সম্বন্ধে নাকি এরকম আরো অনেক কুৎসা শোনা যায়।...... দশ দিন পরে সে ফিরে এল। আমার

কাছে এসে নতজানু হয়ে স্বীকার করল যে ঐ স্ত্রীলোকটার ভেতর সে তার ঘুভিথের রূপ দেখতে পেয়েছিল, তাই সে শিল্প প্রেরণায় তার পেছনে ছুটেছিল। জলভরা চোখে সে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে শিল্পী তার জীবনের সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে তার লক্ষ্যের পেছনে ছুটবে, কত নোংরাই না তাকে ঘাটতে হবে; এতে তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ফণ্টেন আমার হাত জড়িয়ে ধরল, বলল, "তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার ব্যবহারে দোষ নিও না। জান তো তোমাকে কাছে পেলে আমি কত নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

আমি আর ঝগড়া করলাম না, কত টাকাই না ব্যয় হয়েছে ভেবে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সোজাসুজি তাকে বললাম, "দেখ, তোমার এখানে ঘরবাড়ী রয়েছে, অতএব থাকবার অধিকারও তোমার পুরোদস্তুর আছে। কিন্তু এখন থেকে আমার বিষয়ে তুমি আর হস্তক্ষেপ করো না। তোমার মাসহারার একটা বন্দোবস্ত আমি করব। আমার বিষয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবেনা।"—কথাগুলো শুনে রাগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর থেকে সে এমনিভাবে চলত যেন আমি তাকে অতি অন্যায়ভাবে অপমান করেছি।

অদ্ভুত মানুষের প্রকৃতি! যখন ফণ্টেনের হাতভরা টাকা ছিল তখন সে গুনে গুনে খরচ করত, কিন্তু এখন মাসহারা পাবার আগেই সে সব ব্যয় করে বসত; টাকা ফুরিয়ে গেলে ঘরে আটক থেকে রচনায় মনোযোগ দিত। অবনতিও তার যথেষ্ট হল। প্রথমে ধরল মদ খাওয়া। তারপর দুএকদিন আমার তহবিল থেকে কিছু টাকার ঘাটতিও আবিষ্কার করলাম। এ বিষয়ে যদিও আমি তাকে কিছু বলিনি, কিন্তু আমার নজর যে এর ওপর পড়েছে তা সে বুঝতে পেরেছিল,—তাই সে আমাকে টাকা-পয়সা বিষয়ে ঝিচাকর থেকে সাবধান হতে বার বার সতর্ক করে দিল। তখন থেকে ইচ্ছে ক'রেই আমি তার জন্যে এখানে ওখানে কিছু কিছু টাকা

রেখে দিতাম, অথচ লজ্জিত হবার ভয়ে মুখে কেউ কাউকে কিছু বলতাম না।

ক্যানার নামে এক অন্ধ গায়কের সঙ্গে ফন্টেনের পরিচয় হ'ল। ক্যানারকে দেখলে আমার বড্ড ভয় করত। ফন্টেন তাকে খুব করে মদ খাওয়াত; মদ খেয়ে সে হৈ চৈ বাধিয়ে দিত আর পিয়ানো বাজাত। অনেক সময় ভাবতাম এটা কি একটা চিড়িয়াখানা! তারপরই কিন্তু মনে হত—তারা গায়ক, শিল্পী।

আমার মনে আছে, ফন্টেন এই সময় দিনরাত কেবল লিখত আর কাটত, পিয়ানোতে সুর তুলত, আবার দৌড়ে এসে লিখতে বসত। সমস্ত রাত সে ঘরের ভেতর এইভাবে লাফালাফি করত। দিনের পর দিন শরীরের ওপর এই অত্যাচারে তার চেহারা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। সে বলল, "আমার ভেতর যে শক্তি আছে এবার তা সবাইকে দেখিয়ে দেব। বেচা ফন্টেনের স্বরূপ এবার তোমরা বুঝবে।" চোখ দুটো পাকিয়ে সে এমনি করে এই কথাগুলো আমাদের বলত যেন আমরা অর্থাৎ যারা ঝিচাকরের মত তার সেবা করছি, তারাও তার ঈর্ষার পাত্র।

মাঝে মাঝে রাত্রে ফন্টেন অন্ধ ক্যানারকে রাস্তা থেকে তুলে আনত। সমস্ত রাত ভ'র তারা দুজন চীৎকার করত আর পিয়ানো বাজাত; ভোরে উঠে হয়ত দেখতাম ক্যানার দরজার পাশে ঘুমিয়ে আছে।

এ হেন অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাকে চলতে হ'ত। ভাবতাম হয়ত ফন্টেন সত্যি সত্যি বিরাট কিছু সৃষ্টির পথে এগিয়ে চলেছে এবং সেজন্যেই যাযাবরের মত জীবন চালিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু একদিন তারা এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল। রাত তখন অনেক হয়েছে, হঠাৎ এক আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। গাউনটা তাড়াতাড়ি কোন রকমে গায়ে চাপিয়ে স্বামীর ঘরে ঢুকে দেখি যে ক্যানার এক চেয়ারে বসে হাত পা ছুড়ছে আর চেঁচাচ্ছে, গলার পাশে একটা সদ্য ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। ছুরি হাতে ফন্টেন তার পাশে

দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে আর পাগলের মত চোখ ঘোরাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘটনাটা আমি আয়ত্তে এনে ফেললাম, কি ক'রে তা নাই বা বললাম। ক্যানার সেই যে চলে গেল আর আমাদের বাড়ীতে ফেরেনি। ফণ্টেন কেঁদে ফেলল, বলল যে ঐ বদমাসটা তার রচনা চুরি করবার মতলব করেছিল বলেই সে এতটা চটে গিয়েছিল। আমি না এলে সে নাকি তাকে একেবারে শেষ করে ফেলত। তাকে ঠাণ্ডা করতে আমার খুব বেগ পেতে হয়েছিল; বড্ড একগুঁয়ে লোক। জানালা দিয়ে ঝাঁপ দেওয়া থেকে অনেক কষ্টে তাকে বিরত করেছিলাম। ওঃ, কি ঝামেলার ভিতর দিয়েই না আমাকে চলতে হয়েছে!

আবার কিছুদিন ভালভাবে কাটল। ফণ্টেন লিখেই চলল, যুডিথ ও হেলোফার্নেস্‌কে ভিত্তি করে তার গীতিনাট্যটা প্রায় শেষ করে আনল। গান বিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই, তবে হেলোফার্নেসের শিবিরে যুডিথের আগমনের দৃশ্যের অবতারণা করতে গিয়ে সে এমন কতকগুলো অকারণ ও অবাঞ্ছিত উত্তেজক রাগিনীর আশ্রয় নিয়েছিল যা শুনলে সত্যি সবার মন বিদ্রোহ করে উঠবে। তার এই বিদঘুটে ভাবধারা যে সে কোথা থেকে আমদানী করেছিল তা সেই বলতে পারে। আমাকে বাজিয়ে শোনাবার পরে তার মুখে সেই আগেকার মতই জয়ের হাসি ফুটে উঠত আর আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, সত্যি সে মস্ত গায়ক। কি জানি, হয়ত বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তি। প্রায়ই ভাবতাম আমাদের বিয়ে সুখের হয়নি; কিন্তু সত্যি যদি বেড্‌রিথ্‌ অভিনব কিছু সৃষ্টি করে তাহলে নিশ্চয়ই আমার জীবন বৃথা যাবে না।

এমন সময় নতুন এক গায়ক আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করতে লাগলেন, তাঁর নাম মিঃ ট্রোজান। তাঁকে কিন্তু শিল্পী বলে একেবারেই মনে হয় না; লম্বা ছিপছিপে চেহারা, নাকের ডগায় চশমা এসে পড়েছে, ধীর, স্থির, লাজুক। বৈজ্ঞানিক হলেই তাঁকে বরং মানাত ভাল। শুনলাম, চমৎকার গায়ক তিনি, কোন এক নাট্যশালার সঙ্গীত পরিচালক অথবা

ঐ জাতীয় একটা কিছু। প্রায়ই বিকেলে তিনি আমাদের বাড়ীতে আসতেন, ফন্টেনের সঙ্গে আলোচনায় ডুবে থাকতেন আর মাঝে মাঝে আলোচনার ফাঁকে পিয়ানোতে অসংলগ্ন টোকা মারতেন। কফি আর বিস্কুট নিয়ে আমি তাঁদের কাছে যেতেই মিঃ ট্রোজান চট করে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন জানাতে কখনই ভুলতেন না। সব কিছুর ভেতরেই যেন গান। ফন্টেন চোখ দিয়ে ইসারা করতেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম। গান ছাড়া অন্য কোন কথা তাঁদের ভেতর হ'ত না; গানে তাঁরা এমনি মগ্ন ছিল। ফন্টেন বলত, এসব নাকি মহা ঝকমারী ব্যাপার।

একদিন আমি ফন্টেনের ঘরে ঢুকছি এমনি সময় ট্রোজান হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন; আর একটু হলেই আমার গায়ের ওপর এসে পড়েছিলেন আর কি। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে থতমত খেয়ে তিনি বললেন, "দেখুন, ওঁকে বারণ করে দেবেন, বলবেন যে……।"

বেচ্ারিখের জন্যে বড় দুঃখ হ'ল, বললাম, "আপনি কি বলতে চান, ওঁর কোন প্রতিভা নেই ?"

অসহ্য হয়ে ট্রোজান বললেন, "না, না, প্রতিভা তাঁর আছে, কিন্তু…… আমি প্রতিভার কথা বলছি না, ওটা তেমন কিছু নয়। গানে প্রয়োজন ওর চেয়েও আর একটা বড় জিনিষের। তাঁকে বলবেন, তিনি যেন নতুন করে নিজেকে গড়তে চেষ্টা করেন। আচ্ছা, নমস্কার!"—গট্‌মট্ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। অদ্ভুত লোক!

রাত্রে খাবার সময় কৌশলে ফন্টেনের কাছে কথাটা উত্থাপন করলাম। হয়ত তার রচনায় আপত্তিজনক কিছু আছে,—যেমনি এই কথা বলা, ফন্টেনের মুখ অমনি লাল হয়ে উঠল; চামচটা হাত থেকে নামিয়ে সন্দেহের সুরে জিজ্ঞাসা করল, "কেন, ট্রোজান তোমাকে কিছু বলেছে ?"

আমি চট্ করে বলে ফেললাম, "না, না, সে বলবে কেন? এটা আমার নিজের ধারণা। আচ্ছা, ট্রোজান কি গান ভাল জানে ?"

ঘাড় দুলিয়ে তাচ্ছিল্যভরে ফন্টেন বলল, "জানে, তবে ভেতরটা ফাঁকা, কল্পনার বড় অভাব। গীতিনাট্য লিখতে হলে চাই নারকীয় উচ্ছ্বাস; উচ্ছ্বাসের চাবুক মেরে নিজেকে চালাতে হবে। সেদিক দিয়েও একেবারে দেউলে। কিচ্ছু জানে না।"

আর চাপতে পারলাম না, তেতো স্বরে বললাম, "চাবুক মেরে নিজেকে যে কোথায় চালাচ্ছ তা আমার জানতে বাকী নেই। শুনছি, তুমি নাকি আবার কোন্ গায়িকার পেছনে লেগেছ?"—লোকের মুখে শুনেছি এই নতুন গায়িকাটী নাকি তরুণী, সদ্য বিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে, দু'একবার মঞ্চে নেমেছেও। আমি আগেই বলেছি, মেয়েঘটিত কোন ব্যাপারে আমি কখনও ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারিনি, কিন্তু কথাটা যখন উঠলই তখন আমিই বা চুপ করে থাকব কেন?

ফন্টেন বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না। উৎসাহের সঙ্গে বলল, "এই দেখনা, ট্রোজান বলে, যুডিথের ভূমিকা ঐ মেয়েটাকে দিয়ে নাকি চলবে না; হুঁঃ! আমি বলি, ও ছাড়া আর কে আছে যে আমার মানস প্রতিমা যুডিথের দানবীয় রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারবে, যে জাগিয়ে তুলবে তার কামভাব, যার……?" আরো অনেকগুলো কথা বলল, ওসব ছাই আমার কিছুই মনে নেই।

বড্ড রাগ হ'ল স্বামীর কথাগুলো শুনে। ঝাঁঝাল স্বরে বললাম, "ওঃ, তাহলে ওর ভেতর তুমি এসব জাগিয়ে তুলতে চাও?"—

—"নিশ্চয়! ওর শিল্পপ্রতিভা আমি জাগিয়ে তুলব; এই আমি—বেজা ফন্টেন। ওর দেহ, আত্মা নিংড়ে আমি আমার যুডিথ গড়ব।"—

ভেবে দেখুন, এসব কথা সে তার বিবাহিত স্ত্রীকে জোর গলায় শোনাচ্ছিল। সে বলল সবাই নাকি তাকে কোনঠাসা করবার জন্যে ভীষণ চেষ্টা করছে, এমন কি ট্রোজানও। কিন্তু এবার সে কোন কথাই কানে তুলবে না, সমস্ত বাধা উপেক্ষা ক'রে সত্যের সন্ধানে ছুটবে, কোন

আইনের বালাই থাকবে না তার চলার পথে, শুধু থাকবে সেই বন্ধ দানবীর প্রেরণা।

কথা বলতে বলতে ফন্টেনের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছিল, থুতনিটা কাঁপছিল, ভাবের আতিশয্যে টেবিল চাপড়াচ্ছিল। হঠাৎ ফন্টেনের জন্যে ভারী দুঃখ হল। হায়রে হতভাগা! জীবনে কিছুই তুমি করতে পারবে না। চট করে কেন যে এই নিষ্ঠুর কথাটা ভেবে বসলাম ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, বোধ হয় নিজেই সে তার ঢাক পেটাচ্ছিল এই জন্যে। ভেবে অনেকটা আশ্বস্ত হলাম, অন্ততঃ সংসারে শান্তি তাহলে কিছুটা আসবে; অন্নবস্ত্র জোটাবার ভাবনা তো আর নেই। আমার স্বামী একজন খ্যাতনামা লোক হলে আমি যে পৃথিবীর ভেতর সবচাইতে সুখী নারী না হতাম তা নয়, তবে ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলেই হয়ত এই অলক্ষুনে কথাটা ভেবে আনন্দ পাচ্ছিলাম।

এই ঘটনার পরে কয়েকদিন পর্য্যন্ত সত্যি ফন্টেনকে কেউ বাড়ীতে বিশেষ দেখতে পেতাম না; জনরব, সেই তরুণী গায়িকাটির পেছনে লেগেছে। কেবল ভোরে আমরা তাকে দেখতে পেতাম স্নানাগারে, গুনগুন করে গাইত আর শিষ দিত। এইসব করে সে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করত, কি সুখেই না আছে সে! আমার কিন্তু মনে হয়, গায়িকাটির সঙ্গে সে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছিল না। কয়েকদিন পর্য্যন্ত রাত্রিগুলো সে বাইরেই কাটিয়ে দিত, ভোরে বাড়ী ফিরত। বাড়ীতে এসে ভাবভঙ্গিতে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করত যে গায়িকাটির সঙ্গে সে রাত্রি যাপন করেছে। অনেকে কিন্তু বলল যে তারা ফন্টেনকে রাত্রে কোন কফি অথবা মদের দোকানে লেমনেড ইত্যাদি সামনে নিয়ে একা বসে থাকতে দেখেছে এবং কেউ কেউ শেষ রাত্রে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেও দেখেছে। এদিকে আমাদের ঝিও আবার একদিন দেখে ফেলল, ভোরে খেতে আসবার আগে সে তার গালে খুব করে রুজ মাখছে। রুজ মাখবার কারণটাও অতি সহজ;

এই করে সে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করত যে তার গালের ঐ রং তরুণীর রুক্ষ রাঙানো ঠোঁট থেকেই আমদানী করা। ওঃ! ভাঁড়ামির আর অন্ত নেই!

এইভাবে ফন্টেন তার শিল্পপ্রতিভা জাহির করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার গতিবিধির মোড় আবার ফিরল। মোলেগুাকে সে কোত্থেকে জোটাল সেই জানে। বাইরে রাত কাটান বন্ধ হল, মোলেগুাকে নিয়ে পড়বার ঘরে সে আটক রইল। তার সঙ্গে গভীর আলোচনায় আবার মনোযোগ দিল,—যেন এবার সে তার 'যুডিথ' শেষ না করে আর ছাড়ছে না। একদিন পত্রিকায় ফন্টেন তার তরুণী গায়িকাটির নাম দেখতে পেয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "আমার যুডিথের ভূমিকায় নামবে বলে ঐ ছুঁড়িটা বড্ড আশা করেছিল, আর হয়ত সবাইকে বলেও বেড়িয়েছে। কিন্তু সেটি হচ্ছে না!"—অর্থাৎ গায়িকার সঙ্গে সামান্য সম্পর্কেরও অবসান হয়েছে।

মোলেগুা ডাক্তারী পড়ত, কিন্তু গানে আর আলসেমীতে সময় কাটাতে সে ছিল মস্ত ওস্তাদ। শুনলাম, ডাক্তারী আসরে গান গেয়ে সে নাকি বেশ সুনাম অর্জন করেছে। তাছাড়া, অনেক গান সে নাকি রচনাও করেছে। এসব করে বিস্তর টাকা জমিয়ে সে আমেরিকায় যায়, সেখানে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অবতীর্ণ হয়ে চারদিক থেকে প্রচুর বাহবা পেয়ে সম্প্রতি এখানে ফিরে এসেছে। এমনি সময় ফন্টেন তাকে বন্ধুত্বে বরণ করে নেয়।

মাঝে মাঝে সমস্ত দিন ওরা দুজনে ঘরে আটক থেকে গভীর আলোচনায় মগ্ন থাকত, আর ফন্টেন কথার ফাঁকে পিয়ানো বাজাত; কিন্তু বরাবরই ঐ একই রাগিণী শুনতে পেতাম। বাজাবার সময় মোলেগুার ভাবভঙ্গি দেখলে হাসি সম্বরণ করা বিষম দায় হয়ে পড়ত, রাগও হ'ত খুব; —দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে তুলত। ফন্টেন তার গুরুগম্ভীর প্রকৃতি নিয়ে কি করে যে ওর সঙ্গে মানিয়ে চলত, তা কিন্তু আমার ধারণার অতীত।

ফন্টেনের হাতে যখন টাকা পয়সা থাকত তখন প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়ীতে মদের বৈঠক বসত। মোলেগুা বোতলের পর বোতল খেয়েই চলত, তারপর দারুণ মাতাল হয়ে পিয়ানোর সামনে গিয়ে বিকৃত রাগিণী বাজাতে আরম্ভ করত। বৈঠকে আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হ'ত, বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকও অনেকে আসতেন। অতিথিদের চালচলন দেখে মনে হ'ত তারা এক একজন যেন অর্দ্ধেক আমেরিকার মালিক।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ফন্টেন ও আমি বসেছিলাম। কিছুক্ষণ একথা ওকথা বলে অবশেষে ফন্টেন আমাকে জানাল যে এখন থেকে সে নাকি খুব তৎপর হবে ঠিক করেছে। বেডা ফন্‌টেনের স্বরূপ এবার সবার কাছে উদ্ঘাটন না করেই ছাড়বেনা। টাকা পয়সা উপার্জন করতেও যথেষ্ট মনোযোগ দেবে। অর্থাৎ বিরাট এক মতলব সে মাথায় এঁটেছে; মোলেগুার সহযোগে সে এখন চলচ্চিত্রের জন্যে এক গীতিনাট্য লিখবে। সংলাপ প্রায় শেষ করে এনেছে, আর সুরযোজনা হবে নাকি অদ্ভুত।

ফন্টেনের মতে চলচ্চিত্র হচ্ছে আধুনিক জগতের এক অভিনব সৃষ্টি, এবং খুবই সুখের বিষয় যে জনকয়েক সত্যিকারের শিল্পী এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। অবশ্য প্রথমে হালকা বিষয় নিয়েই এতে নামা উচিত।

শুনতে শুনতে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। বড্ড কষ্ট হ'ল ফন্টেনের জন্যে। আমার এই মনের ভাবটা সে বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিল। তক্ষুনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে সে বলল যে এতে নাকি অগাধ টাকার মালিক সে হবে। তাছাড়া, এটা শেষ করেই সে আবার তার 'যুডিথ' রচনায় মন দেবে। কথাগুলো আমার মাথায় ঢোকাবার জন্যে সে অনর্গল বকে চলছিল। আমাকে জানিয়ে দিল যে চলচ্চিত্রে তার এই প্রয়াস যদি পৃথিবীতে নাম কিনতে পারে তাহলে দেখতে দেখতে

'যুডিথ'ও বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠবে। এযুগে জন্মগ্রহণ করলে মোজার্ট, স্মেটানা, এঁরাও যে বিনাদ্বিধায় চলচ্চিত্রের প্রতি মনোযোগ দিত তা জানাতেও সে ভুলল না।

আমি বললাম, "ও, এবার তাহলে তুমি চলচ্চিত্রের কোন অভিনেত্রীকে নিয়ে কেলেঙ্কারী করতে চাও?"

একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল, "এসব কেন আশঙ্কা করছ, বলত'? হ্যাঁ, শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে বইকি! আমার আখ্যায়িকার নায়িকা হেলয়েসের ভেতর এক অদ্ভুত নারীচরিত্র বর্ত্তমান। এই ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে আমরা এক নবাগতার সন্ধান পেয়েছি। মেয়েটা বেশ চটপটে, গলাটাও ভাল, চেহারায় একটা প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। হ্যাঁ দেখ, চলচ্চিত্রে চেহারার ভেতর যৌনআবেদন কিন্তু থাকতেই হবে। তুমি ভেবনা—এই প্রচেষ্টায় চারদিকে আমাদের জয়জয়কার পড়ে যাবে। আর আমি বলে দিচ্ছি, ঐ মেয়েটিরও হলিউডে যাওয়ার বেশী দেরী নেই।"

বাধা দিয়ে আমি বললাম, "থাক, এসব শোনবার আগ্রহ আমার নেই। আমি শুধু জানতে চাই যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এসব কথা আমাকে শোনাতে চাইছ।"

থতমত খেয়ে সে বলল, "উদ্দেশ্য?—উদ্দেশ্য এই, জনকয়েক চলচ্চিত্র-প্রযোজক আমার এই প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আমার একরকম হয়েই গিয়েছে। এখন আমার এই প্রচেষ্টা বিশ্ববিখ্যাত করতে হ'লে চাই সুন্দর একটি চিত্রনাট্য, আর সবার মূলে প্রয়োজন নগদ টাকার।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কত?"

কয়েকবার ঢোক গিলে সে বলল, "তেমন কিছু নয়, এই······ পনের লাখেই হয়ে যাবে। অবশ্য আমাদের বিরাট কাজের কাছে এ অতি তুচ্ছ।"

আমি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "যোগাড় করেছ ?"

ফন্টেন আবার কয়েকবার ঢোক গিলল, মাথা চুলকাতে লাগল। আমতা আমতা করে যা বলল তার অর্থ এই যে আমাদের একটা কি দুটো বাড়ী বিক্রী করলেই তার টাকা সহজেই যোগাড় হয়ে যাবে। (এখানে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে বাবা যে পাঁচখানা বাড়ী আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন তার দুটো ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে)। সে আরো বলল যে টাকা খাটাবার এ নাকি এক চমৎকার ব্যবস্থা। এক বছরের ভেতরেই যে তার দ্বিগুণ টাকা ঘরে আসবে, তা সে আমাকে কাগজে-কলমে লিখে দিতে পারে।

আমি বললাম, "তোমাকে বিয়ে করে দুটো বাড়ী খুইয়েছি। ঢের হয়েছে, আর নয়। এক কপর্দকও আর আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। দয়া করে আমার কাছে এর পুনরুল্লেখ করো না।"

ফন্টেনের চোখ জলে ভরে উঠল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অপমানিতের সুরে বলল, "আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে আমার ওপর তোমার আর বিশ্বাস নেই। আমার সুভিখের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি এই সম্বন্ধে নেমেছিলাম। যাক, আমার শেষ ঘনিয়ে এসেছে। সব শেষ, সব শেষ!" —বেরিয়ে যাচ্ছিল, দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "মনে রেখো, আত্মহত্যাই এখন আমার একমাত্র পথ।"

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "বোকার মত যাতা কি বলছ ?"

যেন এক ছোট্ট ছেলে তার দোষ স্বীকার করছে এমনি ভাবে সে মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে রইল, অসহায় ভাবে বলল, "আমি যে চেক লিখে দিয়েছি।"

"অঁ্যা," আমি আৎকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কত টাকার ?"

—"সাত লাখ ক্রাউনের।"

পরে কিন্তু জানলাম, বার লাখ ক্রাউনের চেক সে লিখে দিয়েছে। অবশ্য তার কাছে সাত আর বারতে তেমন কিছু পার্থক্য নেই।

—"চেক তুমি পেলে কোথায়? নিজের বলতে যে তোমার কানা কড়িও নেই।"

মুখ কালো করে ফন্টেন ধীরে ধীরে বলল, "আমি ওদের বলেছি যে তোমার সম্পত্তিতে আমার সমান অধিকার আছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার এই কাজে বাধা দেবে না।"

আমি চীৎকার করে উঠলাম, "হায় ভগবান, বোকা পেয়ে ওরা যে তোমাকে ঠকাবার চেষ্টায় আছে তা কি বুঝতে পারছ না?"

—"তা আমি খুবই জানি। কিন্তু শুধু আমার যুডিথের কথা ভেবেই আমি এ কাজে নেমেছিলাম।......আমি জানি, আজ আমি সর্ব্বস্বান্ত। এর চেয়ে এক কাজ করো না কেন? আমাকে একেবারে মেরে ফেলো, তাহলে বেড়া ফন্টেন আর কোনদিন তোমার কাছে অনুগ্রহ চাইতে আসবেনা।"

আমি বললাম, "তুমি যা খুশী করতে পার, কিন্তু আমি সমস্ত বিষয় উকিলের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। আর কথা নয়!"

সেদিন সমস্তরাত ফন্টেনকে ঘরের ভেতর চলাফেরা করতে আর মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজাতে শুনেছিলাম। ভোরে তার আর দেখা পেলাম না, দশদিন তার টিকিটির দর্শন পর্য্যন্ত মিলল না। ঘরের ভেতর কতকগুলো পোড়া কাগজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। মেঝেতে অর্দ্ধেকটা পোড়া কাগজ নজরে পড়ল; তাতে লেখা রয়েছে,—"যুডিথ—পঞ্চাঙ্ক গীতি-নাট্য—রচনা ও সুর: বেড়া ফন্টেন"।

আমার উকিল ছিলেন একজন বিচক্ষণ বৃদ্ধ, আমার বাবার বন্ধু। আমাদের পরিবারের পুরোনো বন্ধু হিসেবে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। আমি বললাম, এর একটা বিহিত করা চাই-ই। তিনিও কোন বিহিত না করে ছাড়ছেন না, অবিলম্বে বিবাহবিচ্ছেদের পরামর্শ দিলেন। তা না হলে, তাঁর আশঙ্কা করেন, অচিরে আমার সম্পত্তি বলতে দরজার একটা হাতলও

বাকী থাকবে কিনা সন্দেহ। চার লাখ ক্রাউন গচ্চা দিয়ে আমার উকিল আমার স্বামীর সইকরা চেকগুলো ওদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। কি করে এসব করলেন জানি না।

এই সময় ফন্টেন ফিরে এল। তার দৈন্যদশা দেখে মনে হল এ ক'দিন নিশ্চয়ই সে পার্কের বেঞ্চে রাত কাটিয়েছে। একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ নিতে সে ফিরে এসেছে, একথাই সে আমাদের জানাল। ঝি যখন তাকে খাবার দিয়ে এল তখন সে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলল না। ধন্যবাদ দেওয়ার সময় ঠোঁট দুটো তার কাঁপছিল, কথা আটকে আসছিল, চোখ দুটো ছল-ছলিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ ইঁদুরের মত চুপটি করে ঘরে বসে রইল। কি যেন লিখল, একটু আধটু পিয়ানোও বাজাল, তারপর গানের কাগজ কিছু জড় করে আবার সে বেরিয়ে পড়ল। তখন নভেম্বর মাস, ইচ্ছে করেই গরম জামাটা রেখে গেল, শুধু ভেলভেটের জামাটা গায়ে ছিল। হাওয়ায় তার গলবন্ধ উড়ছিল,—যেন এক বুভুক্ষু শিল্পী!

এদিকে আমার উকিল বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্ত বন্দোবস্তই একরকম করে ফেললেন। ফন্টেন তো শুনে কেঁদে ফেলল, উকিলকে বলল, "জানি, আমি জানি, শিল্পীর খেয়ালী-জীবনের সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সহজ জীবনকে বেঁধে কেন শুধু শুধু কষ্ট বরণ করতে যাবে? আপনি শারলোটাকে বলবেন যে তার স্বাধীনতায় আমি আর হস্তক্ষেপ করব না।"

বিচ্ছেদকে অতি সহজভাবে গ্রহণ করবার ভান ফন্টেন করেছিল। আমার উকিল তাকে জানিয়ে দিলেন যে তার জন্যে মাসহারার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, প্রতি মাসে অফিসে গিয়ে সে যেন তার প্রাপ্য টাকা নিয়ে আসে। ফন্টেন আগুন হয়ে উঠল, "কি! টাকা! আমাকে কি আপনারা রাস্তার ভিখারী পেয়েছেন? বরং না খেয়ে মরব তবু দান গ্রহণ করব না জানবেন।"

—"বেশ, শ্রীমতী কারলিকাকে একথা জানিয়ে দেব।"

লোকের কাছে শুনেছি ফন্টেন নাকি তার হাতের ওপর মাথাটা রেখে হতাশার হাসি হেসে বলত, "আপনারা ঠিক বলেছেন, আমি ভিখারী। আমি শিল্পী॥ আপনারা বোধ হয় পাচশ' ক্রাউনও আমাকে অগ্রিম দিতে ভয় পান, না?"

এই ঘটনার পর থেকে ফন্টেনের খবর আমি বিশেষ রাখিনি। একদিন পথে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার মনের অবস্থা তখন যে কি হয়েছিল তা আমি কেমন করে বোঝাব। আলুথালু চুল, ময়লা গলবন্ধ, বগলে এক তাড়া গানের কাগজ—ঠিক একটা পাগলের মত দেখাচ্ছিল তাকে।

তার প্রাপ্য টাকা আনবার জন্তে প্রতি মাসে ফন্টেন আমার উকিলের অফিসে যেত। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টাকাগুলো পকেটে পুরে অফিসের লোকদের আভাষ দিয়ে যেত যে তার 'যুডিথ' মঞ্চস্থ করবার জন্তে সে এক আমেরিকান না কোথাকার কোন্ থিয়েটার দলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে। অথবা সে বলত, এখন নাকি সত্যিই সে-মুক্ত; পঙ্কিলতা আর দুঃখ-কষ্টের ভেতরেই নাকি শিল্পীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়, ইত্যাদি।

একদিন ফন্টেন হন্তদন্ত হয়ে অফিসে এসে জানিয়ে গেল যে এক সপ্তাহের ভেতরেই কোন্ এক সিনেমা-ষ্টুডিওতে তার 'যুডিথের' মহড়া হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু সঙ্গীতজ্ঞ আর মঞ্চশিল্পী সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমার উকিলকে দুটো টিকিট দিয়ে বলল, "একটা আপনার জন্তে, আর একটা ......।" একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "গান ভালবাসে এমন কাউকে দেবেন।"

অবশ্য আমি যাইনি।

এক সপ্তাহ পরে এক মর্ম্মন্তুদ খবর পেলাম। ফন্টেনকে পাগলা গারদে পাঠান হয়েছিল, সেখানে দুদিন পরে তার মৃত্যু হয়। হায়রে হতভাগ্য! খবরের কাগজে তার মৃত্যু-সংবাদটা পর্য্যন্ত উঠল না!

জাঁকজমক করে শবযাত্রার বন্দোবস্ত করলাম। তার ইচ্ছানুযায়ী শব দাহেরই বন্দোবস্তব করা হ'ল। আমাদের সান্ধ্যবৈঠকে যে-সব গায়কবৃন্দ

আসতেন তাঁদেরও বিশ পঁচিশ জন তাকে দেখতে এলেন। তাঁদের ভেতর মিঃ ট্রোজানও এসেছিলেন, চশমার পেছনে তাঁর চোখদুটো ছল ছল করছিল। মোলেণ্ডা তার দলবল নিয়ে এসেছিল, শিশুর মত হাউ হাউ ক'রে সে কাঁদছিল। সেই তরুণী গায়িকা, যার পেছনে ফন্টেন একসময় খুব ঘুরেছিল, তাকেও দেখতে পেলাম; গানে সে এবছর খুব নাম কিনেছে।

সবচাইতে আশ্চর্য্য যা ঘটেছিল, হঠাৎ হ্যাণ্ডেলের লার্গো বেজে উঠল, একজন বিখ্যাত সুরকার বাজাচ্ছিলেন। আরো অনেকে বাজালেন— বিশ্ব-বিশ্রুত সব রাগিনী। কে এসবের ব্যবস্থা করেছিলেন জানি না, বোধ হয় মিঃ ট্রোজান অথবা আর কেউ।

আবহাওয়াটা আমার বড় ভাল লাগছিল, অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, কেঁদে ফেললাম।...... নিশ্চয়ই ফন্টেন একজন উঁচু দরের শিল্পী ছিল; তাই যদি না হবে তবে না চাইতেই কেন এই বিশিষ্ট গায়কদের সমাবেশ? সত্যিই, প্রকৃত শিল্পীর শবযাত্রা ঠিক যেরকম হয়ে থাকে ফন্টেনের বেলায় তাই হয়েছিল।

তাই মাঝে মাঝে ভাবি, হয়ত সে কিছু সৃষ্টি করতে পারত। আমি মেনে নিচ্ছি, তার স্ত্রী হবার উপযুক্ত আমি নই; কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার নয় যে আমিই তাকে সমাজে আসন দিয়েছিলাম। হয়ত আমি তাকে বুঝতে পারিনি, কিন্তু কি করব! সাধারণ স্ত্রীলোক আমি, তাকে সাধারণের চেয়ে বেশী দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে।

ফন্টেনের স্মৃতিস্বরূপ একটা বীনা আমি রেখেছিলাম। তাতে লেখা, "বেড়া ফন্টেন,"—আর কিছু নয়।

[শ্রীমতী কারলা কনটিনোভার ডায়েরী]

মিঃ ফন্টেনের সঙ্গে আমি প্রথম পরিচিত হই তাঁরই বাড়ীতে অনুষ্ঠিত আমাদের অধ্যাপকমণ্ডলীর এক সখের বৈঠকে। অনুষ্ঠান-শেষে মিঃ ফন্টেন যখন জানলেন যে সাহিত্যের ইতিহাসই হচ্ছে আমার বিষয় তিনি তখনই টেনে আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর কথাবার্ত্তায় মনে হল, উচ্চশিক্ষিত ধনী যুবক তিনি, গানের খুব ভক্ত, সুন্দরের পূজারী। আমাকে বললেন, অ্যাবেলার্ডাস আর হেলোয়েসের জীবনী তাঁর খুব ভাল লেগেছে এবং এদের নিয়ে তিনি একখানা উপন্যাস অথবা গীতি-নাট্য রচনা করবেন ঠিক করেছেন। তাই আমি যদি তাঁকে অ্যাবেলার্ডাস ও সেই সময়ের ইতিহাস কিছু বলি তাহলে তাঁর বিশেষ উপকার হয়।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন সূক্ষ্ম বিচারমূলক দর্শন আর সন্ন্যাসবাদে সমস্ত ইউরোপ ছেয়ে গিয়েছিল সেই সময়ের ইতিহাস আমার অতি প্রিয় বিষয়। তাই তাঁর কথায় আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম, বক্তৃতার ভঙ্গিতে মধ্যযুগের নামবাদের আলোচনা করলাম, অনেক গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলাম। এমন কি স্মিড্‌লারের অভিমতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতেও ভুললাম না, কারণ আমার মতে অ্যাবেলার্ডাস আর হেলোয়েসের চিঠিগুলো সব খাঁটি।

মিঃ ফন্টেন খুব আগ্রহের সঙ্গে আমার কথাগুলো শুনছিলেন। যদিও আমার বক্তৃতার অনেকাংশই তাঁর গীতি-নাটিকার কোন সাহায্যেই আসবে না তবুও আবেগভরে বলে চললাম। প্রয়োজন হলে যে তাঁকে আরো মালমসলা দিতে পারব তাও জানিয়ে দিলাম।

মিঃ ফন্টেন সুখী হয়ে আমাকে আগে থেকেই ধন্যবাদ জানালেন। একজন কবি বা সুরকার যে এসব ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে গভীর গবেষণা করছেন এতে আমি সত্যিই আনন্দিত হলাম, এবং তাঁকে এক গাদা বই আর অনেক

প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর ধার দিলাম। পরে আর একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তাঁর কাজ কতদূর অগ্রসর হল জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে তাঁকে অবিশ্রাম খাটতে হচ্ছে। তিনি আরো বললেন যে গীতি-নাটিকার বিষয়বস্তু হিসেবে অ্যাবেলার্ডাস আর হেলোয়েসের প্রেম গভীর অর্থপূর্ণ। বলা বাহুল্য, তাঁর কথায় আমি খুবই আনন্দিত হলাম। বাস্তবিক, সভ্যতার ক্ষেত্রে দ্বাদশ শতাব্দীর দান অপরিসীম। আমি ভাবলাম, তাঁর রচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বই আর দামী কাগজ পত্তরগুলো না হয় তাঁর কাছেই থাক। এরপর কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তাঁকে অ্যাবেলার্ডাসের সম্বন্ধে গেয়ার সম্পাদিত সভাষ্য বইখানা আর দিতে পারিনি। এই নতুন বইখানিতে অ্যাবেলার্ডাসকে আটক রাখা সম্বন্ধে নতুন কিছু বলা হয়েছে।

পরে জানতে পারলাম যে অতি শোচনীয় অবস্থার ভেতর মিঃ ফন্টেনের মৃত্যু হয়েছে। আমার বইগুলো আর দামী কাগজপত্তরও নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যুর পরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মধ্যযুগের কোন বিষয় এ যুগের একজন তরুণ প্রতিভাশালী সুরকারকে যে এমনিভাবে মোহিত করেছিল, এ সত্যি আশার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁর ভাবধারাকে রূপ দিয়ে যেতে পারলেন না, তার আগেই ওপার থেকে তাঁর ডাক এল।

[অধ্যাপক ট্র্যাসের ডায়েরী]

এক নাট্যশালায় ফণ্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয়। আগে থেকেই শুনেছিলাম যে লোকটি বিত্তশালী, শিল্পে বিশেষ অনুরাগী। প্রথম দিনের পরিচয়ে আমার ধারণা হল যে লোকটা কপট আর ভয়ানক দাম্ভিক, কিন্তু আলাপী। সত্যি কথা বলতে কি, তার পোষাক পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে তাকে পুরোদস্তুর একটি ফতুরবাবু বলেই মনে হ'ল। বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে তার বাড়ীতে সান্ধ্যবৈঠকে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করল। এত করে বলল যে বিশেষ অনিচ্ছা থাকা সত্বেও যাব বলে কথা দিলাম। পরে অবশ্য ছাপানো নিমন্ত্রণের একখানা চিঠিও পেয়েছিলাম।

সেখানে মাত্র একটি বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। ফণ্টেন আমাকে অভ্যর্থনা করে বসাল ; তারপর কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বৈঠকে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে বসে আছেন তার স্ত্রী,—মুখশ্রী পাণ্ডুর, চালচলন অতিমাত্রায় আড়ষ্ট, যেন ফেকাশে ভাব।

খানসামা দুজনকে দেখেই চিনে ফেললাম, বুঝলাম সান্ধ্য-বৈঠকের জন্যে শহরের রেস্তোঁরা থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। জমকালো পোষাক পরে তারা দুজন খাবার পরিবেশন করছিল। প্রায় চল্লিশজন ভদ্রলোক এসেছিলেন. তাঁদের অধিকাংশকেই আমি চিনি। নিমন্ত্রিতদের ভেতরে অর্দ্ধেকের অবস্থা ঠিক আমারই মত হয়েছিল অর্থাৎ হাঁপিয়ে উঠছিলেন, বাকী অর্দ্ধেক খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। সব কিছুর ভেতরেই কেমন যেন অদ্ভুত, অসংলগ্ন আবহাওয়ার গন্ধ পেলাম। ঘরের ভেতরে রং-বেরংএর পোষাক পরে নিমন্ত্রিতরা সবাই বসে আছেন। ফণ্টেন বেগুনে রংএর একটি জামা পরে হৃষ্ট চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; কখনো কারো পিঠ চাপড়াচ্ছে, কাউকে

খাবারের টেবিলে নিয়ে যাচ্ছে, কখনো বা কোন গায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে,— ঠিক ছাঁচে ঢালা ভোজদাতার মত।

উদরের কার্য্য সমাধা করে সবাই ঢুকলাম গানের ঘরে। কেউ সোফায় বসল, কেউ দাঁড়াল দরজা ধরে, কেউ পিয়ানোর সামনে, আর কেউ বা বেহালা বাজাতে লাগল। নেহাৎ মন্দ লাগছিল না, তবে সবচাইতে উপভোগ করছিলাম সেই দৃশ্যটি যেখানে ফন্টেন আর তার স্ত্রী শিল্পীবেষ্টিত হয়ে মাঝখানে রাজারাণীর মত বসেছিল এবং ফন্টেন মাঝে মাঝে অর্দ্ধনিমীলিত চোখে গানের সঙ্গে মাথাটা এলিয়ে দিচ্ছিল আর তার স্ত্রী অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন। কেন জানি না, এসব কাণ্ডকারখানায় আমার বড় রাগ হচ্ছিল; এসব ছ্যাবলামীর জন্যেই কি আমাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

বৈঠক-শেষে ফন্টেন আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল, সহানুভূতির সুরে বলল, "আপনার সঙ্গে পরিচয়ে অমি খুব খুসী হয়েছি। আপনাকে সাহায্য করতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত।" আমাকে সাহায্য করবে! আমি বেশ একটু ঘাবড়ে গেলাম। সে বলল যে নাটক আর শিল্প সম্বন্ধে সে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কয়েকটা ঢোক গিলে আবার বলল, "আমিও এক গীতিনাট্য লিখেছি, প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষ করে এনেছি।" চুলের গুচ্ছের ভেতর হাত চালিয়ে সে বলে চলল, "আমার মতে সংলাপ সুরকারের নিজেরই রচনা হওয়া উচিত। তাহলেই তার সৃষ্টিতে সত্যিকারের রূপ ফুটে উঠবে, বাইরের কোন বস্তু এতে থাকবে না।"

এতে প্রতিবাদ করবার কিছুই ছিলনা। এই একটা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফন্টেন আমাকে বলে চলল; অবশেষে আসল কথাটা পেড়ে বসল, আর সেটি হচ্ছে এই: তার রচনাটা আমার পক্ষে পড়ে নেবার অর্থাৎ সংশোধন করবার সময় হবে কি না যাতে ওটা একটা বিশেষ সমালোচনার বিষয় হতে পারে। ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে সে বলল, "কাব্য-প্রতিভার চেয়ে সঙ্গীত-প্রতিভাই আমার ভেতরে বেশী।"—আবার সে ফিরে এল

আমার নাট্য-সমালোচনার কথায়। কি আর করি! সবে তার নুন খেয়েছি, সুতরাং বলতেই হ'ল যে তার রচনা পড়বার সুযোগ পেলে খুব আনন্দিত হব। আমার হাতখানা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সে বলল, "কালই আপনার কাছে পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়ে দেব। চলুন, ওঘরে আবার সবাই বসে আছে।"

সবাই কিন্তু ইতিমধ্যে প্রচুর পানাহার করে হুল্লোর আরম্ভ করে দিয়েছে। গৃহকর্ত্রী ওদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে মৃদু হাসছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বেখাপ্পা হয়ে উঠছেন। কণ্টেন ঘরে ঢুকেই আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠল, "চালান, চালান, এতো আপনাদেরই বাড়ী,—শিল্পীর আখড়া!"

পরের দিনই পাণ্ডুলিপি চলে এল, সঙ্গে এল ঝুড়িতে করে প্রচুর খাদ্যসম্ভার। রচনাটা সত্যিই অদ্ভুত! মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রথমে কয়েকটি সুন্দর ছন্দ, তারপর কয়েক লাইন বাজে বকুনি, তারপর সচ্ছল কথোপকথন, আবার কথার অসাড় বিনুনি। ভেবেছে এক কিন্তু হয়েছে আর। জীবনের স্পন্দন নেই ছিটেফোঁটাও। একটি চরিত্র এল, তাকে বুঝতে না বুঝতেই সে কোথায় গেল মিলিয়ে; আবার এল এক নতুন চরিত্র। চরিত্রের সংখ্যা বেড়েই চলল; এদের মনে রাখা এক বিষম দায়! চরিত্রলিপি খুঁজতে গিয়ে অনেকেরই ঠিকানা পেলাম না।

প্রথম অঙ্কে এক্রণ নামে এক মেষপালকের সঙ্গে যুডিথের প্রেমের অবতারণা করা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে এক্রণ গেল মিলিয়ে, সেনাপতি রবোয়ারূপে তাকে দেখতে পেলাম; তারপর সবই অদৃশ্য হয়ে গেল। একেবারে খিচুড়ী তৈরী করে ফেলেছে, কি যে সে বলতে চায় তা সেই জানে!

আবার পড়বার চেষ্টা করলাম, কয়েকটা মধুর পংক্তি চোখে পড়ল। চট্ করে মনে পড়ে গেল ফ্র্যান্টা কুপেকীর একটা কবিতার কথা। সেটার সঙ্গে এটা যেন অনেকটা মিলে যাচ্ছে, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না।

বিকেলেই পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে কুপেকীর সঙ্গে দেখা করলাম, বললাম, এই কবিতাটা পড়তো, ক্র্যাপ্টিক্! এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?"

কবিতাটার ওপর চোখ বুলিয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে কুপেকী বলল, "কিন্তু বাকীটা কোথায়?"—তাড়াতাড়ি কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে সে হেসে ফেলল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "হায় ভগবান!"

আমি বললাম, "আচ্ছা ক্র্যাপ্টিক্, যুডিথের এই কথাগুলো টেরেবার লেখা বলেই তো মনে হচ্ছে, তাই না?"

কুপেকী মাথা নেড়ে বলল, "তাহলে টেরেবাকেও হজম করেছে। আরে, তাইতো হে, এ নির্ঘাত টেরেবার লেখা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাকে সে এর জন্যে কত দিয়েছে?"

কুপেকী গর্জে উঠল, "কে? ঐ হতভাগাটা? গোটা বইটার জন্যে তিন হাজার ক্রাউন দিয়েছে। কিন্তু এখানে তো দেখছি মাত্র কয়েকটা জায়গা তুলে দিয়েছে, আর ভাল কলিগুলো আগাগোড়া বাদ দিয়েছে। কমপক্ষে পাঁচজনের লেখা জড় করে এটা তৈরী হয়েছে। দেখনা, এটা হচ্ছে ভস্‌মিকের, আর এটা (একটা পাতায় গভীর মনযোগ দিয়ে)······এটা কার হতে পারে?—ঠিক ধরতে পারছি না। আর এই দেখ, এই লাইনটা হচ্ছে লোহ্‌টার। লোহ্‌টাকে চেনো তো? বাবা, সাংঘাতিক লোক তো!"

—"তোমার রচনা সে কি করে পেল?"

ঘাড় দুলিয়ে কুপেকী বলল, "কি করে? হঠাৎ সে একদিন আমার কাছে এল। অবশ্য আমার মত একজন কবির দর্শন পেয়ে সে খুব খুশীই হয়েছিল।"

—"সান্ধ্যবৈঠকে কোন দিন নিমন্ত্রণ পাওনি?"

গম্ভীর হয়ে ক্র্যাপ্টা বলল, "না, সে তো এসব চাষাড়ে লোকদের নিমন্ত্রণ করে না। তার বাড়ীতে যে তোমাকে যাযাবরের ভঙ্গিতে চলতে

হবে। তবে পোষাকটা কিন্তু ভাই পরিপাটি চাই, ড্রইং রুমের উপযোগী। আমার এখানেই সেই কলাবিশারদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। ইচ্ছে করেই আমি তার কাছে ঘেঁষিনি, কিন্তু সেই গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল। সে বলল, সে নাকি একটা গীতি-নাট্য রচনা করেছে, আর সংলাপও তার নিজেরই রচিত। কিন্তু তার পক্ষে সংলাপ নিয়ে মাথা ঘামান সম্ভব নয়, কারণ সঙ্গীতের ওপরই সে মনঃসংযোগ করেছে বেশী। তাই আমি যদি আমার রচিত কয়েকটা কবিতা দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারি তাহলে বড় ভাল হয়!"

কয়েকটা পাতা লক্ষ্য করে আমি বললাম, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, এই অসাড় কথাগুলো তার নিজেরই লেখা।"

ক্ল্যাণ্টা গর্জ্জে উঠল, "এক অক্ষরও তার লেখা নয়, তার সাকরেত আছে।"

—"লোকটা পাগল নাকি?"

কিছুক্ষণ ভেবে কুপেকী বলল, "বোধ হয় না! তবে হ্যাঁ, কবিদের সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না।"

* * * *

"পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে নিতে এলে আমি ফণ্টেনকে বললাম, "দেখুন, আপনি ভাল কাজ করেননি। আপনিই একদিন বলেছিলেন যে সংলাপ সুরকারের নিজেরই রচনা হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে তো দেখছি আপনি কমপক্ষে পাঁচ জনের লেখা জড় করেছেন, পাঁচটা বই থেকে ভুলে খিচুড়ী তৈরী করেছেন। মাথা লেজ খুঁজে পাচ্ছিনা, ধারাবাহিক ঘটনার অভাব লক্ষ্য করছি। এটাকে বরং ছিঁড়ে ফেলুন, মিঃ ফণ্টেন।"

ফণ্টেনের চোখ ছলছলিয়ে উঠল, বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমতা আমতা করে বলল, "আপনি কি দয়া করে এগুলো একটু

গুছিয়ে দিতে পারেন? অবশ্য শুধু শুধু আপনাকে একাজ করতে বলছিনা, এর জন্যে আপনি কিছু পাবেন।"

—"মাফ্ করবেন, আমি পারব না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, পাঁচজনের রচনা কিনে নিজের বলে চালিয়ে নেবার অর্থ কি?"

কথাটায় সে বড় আঘাত পেল, বলল, "যুডিথ আমার নিজের আধ্যাত্মিক সম্পত্তি। যুডিথের জীবন অবলম্বন করে কবিতা অথবা গীতি-নাট্য লেখার কল্পনা সম্পূর্ণ আমার।"

আমি বললাম, "হুঁ! অবশ্য এর আগে জোয়াকিম্ গ্র্যাফ, মিকুলাস, কোনাক্, হান্স্ স্যাচ্স্, ওপিট্জ্, হেবেল, নেষ্ট্রয়, কাইজার প্রভৃতি কবিগোষ্ঠীও এসম্বন্ধে বহু ভাবে ভেবেছেন, আর সেরভ্, ওয়েট্জ্, হোনেগার, গুসন্স্, এমিল নিকোলাই, কন্ রেঁনিসেক্—এঁরাও এ বিষয়ের ওপরে গীতি-নাট্য লিখেছেন, এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক লেখা হবে আশা করা যায়। কিন্তু তাই বলে—।" ফন্টেনের মুখের অবস্থা দেখে বড় দুঃখ হ'ল, কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, "সমস্তই ঘটনার পরিবেশনের ওপর নির্ভর করছে।"

ফন্টেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল, উৎসাহের সঙ্গে বলল, "আপনি ঠিক ধরেছেন। যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি যুডিথকে কল্পনা করেছি, তা আমার সম্পূর্ণ নিজের। হেলোফারনেস্ কুমারী যুডিথের ভেতরে কি করে নারীত্বের কামনা জাগিয়ে তুলল, তাকেই আমি রূপ দিতে চাই। বিষয় বস্তু অতি অভিনব হবে, তাই না?"

এই জীর্ণ ভাবধারার পক্ষে বা বিপক্ষে কিই বা বলব! বললাম, "দেখুন, সঙ্গীতের ওপরেই সব কিছু নির্ভর করে। এক কাজ করুন। কোন বিশিষ্ট লেখককে দিয়ে সংলাপটা লিখিয়ে নিন, আর তাতে তাঁর নামটাও জুড়ে দিন।"

আনন্দের সঙ্গে ফন্টেন আমার প্রস্তাব গ্রহণ করল। সে বলল, আমিই নাকি তাকে ঠিক বুঝতে পেরেছি এবং কাজে লাগবার জন্যে তাকে নতুন

উদ্দীপনা দিয়েছি। অথচ তার কি উপকার যে আমি করলাম তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারলাম না। আবার একঝুড়ি খাবার আমার বাড়ীতে এল।

দু'একমাস পরে আবার ফন্টেন একদিন আমার কাছে এল। তার চোখে মুখে জয়ের ছাপ লক্ষ্য করলাম। আমার সামনে পাণ্ডুলিপি রেখে সোৎসাহে সে বলল, "এই এনেছি আমার যুডিথ। হ্যাঁ, এবার আর এতে এতটুকু খুঁত পাবেন না। আমার কল্পনার সম্পূর্ণ রূপ দিতে পেরেছি এতে। আশা করি, এবার আপনি খুশী হবেন।"

সন্দেহের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি নিজেই লিখেছেন?"

কয়েকবার ঢোক গিলে সে বলল, "হ্যাঁ, আমি লিখেছি, আগাগোড়া আমি নিজেই লিখেছি। এ আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা,—এখানে কি আর আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি? এযে সম্পূর্ণ আমার!"

পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে চললাম। দু-এক মিনিটের ভেতরেই বুঝতে বাকী রইল না, কোথায় এসেছি আমি। সেই পুরোনো পাণ্ডুলিপিরই একটু নতুন পরিবেশন হয়েছে মাত্র, আর তার ওপর দু'একজন নতুন লেখককে ঢোকান হয়েছে।

আমি বল্‌লাম, "ঢের হয়েছে, আর দেখতে হবে না! নিশ্চয়ই আপনাকে কেউ ঠকাচ্ছে মিঃ ফন্টেন। এর অধিকাংশই হচ্ছে হেবেলের যুডিথ থেকে চুরি করা। বাইরে কি করে এটা প্রকাশ করবেন?"

দুঃখে লজ্জায় ফন্টেনের মুখ লাল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বলল, "আমি যদি লিখে দিই—হেবেলের যুডিথ অবলম্বনে বেডা ফন্টেন রচিত?"

আমি সাবধান করে দিলাম যে এরকম দুঃসাহস সে যেন কখনো করেনা; কারণ হেবেলকে এখানে বিকৃত করা হয়েছে, আর এটা প্রকাশিত হলে আইনের কাছে সে দণ্ডনীয় হবে। লেখাটা পুড়িয়ে ফেলতে পরামর্শ দিলাম।

চট্ করে ফন্টেন পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বুকের কাছে তুলে নিল, যেন কি এক মূল্যবান সম্পত্তি আমার হাতে পড়ে নষ্ট হতে

যাচ্ছিল। রাগে চোখ তার জলজল করছিল; আহত সিংহের মত চীৎকার করে উঠল, "কি? এত বড় স্পর্দ্ধা! আপনি এটা পুড়িয়ে ফেলতে চান! এ আমার যুডিথ, আমার রক্ত, আমার প্রাণ। এটা আর কেউ লিখেছে কিনা তা আমি জানতে চাই না।"—আবেগের আতিশয্যে সে পাণ্ডুলিপিটা বুকে চেপে ধরল।

বুঝলাম, ফন্টেন তার যুডিথকে ভয়ানক ভালবেসে ফেলেছে। শত্রুর হাত থেকে একে রক্ষা করতে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে সে হয়ত ইতস্ততঃ করবে না। আমি শুধু ঘাড়টা দুলিয়ে বললাম, "বোধ হয় আপনার কথাই সত্যি, মিঃ ফন্টেন। মানুষ যখন কোন কিছু ভালবাসে, একদিক থেকে বিবেচনা করলে সেটা সত্যিই তার নিজের। দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনার রচনাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করব না; পরের বই থেকে ধার করেছেন এ আমি বলবই। আর, আপনিই বা আমাকে একটা বোকা ভেবে নিন না কেন? তাতে তো আর কোন পক্ষেরই লোকসান হচ্ছে না, দু'পক্ষই সন্তুষ্ট থাকবে।"

রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে ফন্টেন বেরিয়ে গেল। এরপর থেকে আমি তার চোখে এক ঘৃণিত বস্তু হয়েই ছিলাম। সাহিত্যিক-চালে সে আমাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। সত্যি, পুরোদস্তুর সাহিত্যিকের ভাবভঙ্গি আয়ত্ত করতে তার জুড়িদার কেউ ছিল কিনা সন্দেহ।

[ডক্টর জে, পেট্রুর ডায়েরী]

যে সময়ের কথা বলছি তখন আমি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আমার সঙ্গী বলতে ছিল দু'জন,—একজন হচ্ছে বেহালাবাদক প্রচাৎকা ওরফে ল্যাডিসেক্, আর একজন মাইকৃস্ ওরফে ফ্যাটী। আর্থিক অবস্থা আমাদের তিন জনের একরকমই ছিল, ছেঁচড়ামি করে কোনরকমে নিজেদের খাওয়া পরা চলত।

একদিন আমাদের মাষ্টারমশাই আমাদের তিনজনকে ডেকে বললেন, "একজন সঙ্গীতবিশারদের সন্ধান পেয়েছি, সেখানে হয়ত তোমাদের কিছু সুবিধে করে দিতে পারব। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তিনি তোমাদের মত দু' তিনজন ভাবী শিল্পীদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপাততঃ তোমরা মাসিক দেড়শ' ক্রাউন করে পাবে। অবশ্য বর্ত্তমানে মাইনে তেমন কিছু নয়, তবে এখানে লেগে থাকলে ভবিষ্যতে আশা আছে। দেখো, আমার বদনাম করো না কিন্তু। ভাল পোষাক পরে ফিটফাট হয়ে যেও। আর শোন, পিয়ানোর ওপরে কখ্খনো টুপি রাখবে না, বুঝলে? আমার নাম করে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।"

দেড়শ' ক্রাউন! এ্যাঁ, এ-যে স্বর্গের দান! তিনজনে এক সঙ্গে মিঃ ফন্টেনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পরিচারিকা মিঃ ফন্টেনের কাছে আমাদের নিয়ে গেল। তিনি তখন একটি প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে বসে কি যেন লিখছিলেন। আমরা ঢুকতেই তিনি মাথাটা তুলে চশমা ঠিক করে আমাদের প্রত্যেককে ভাল করে লক্ষ্য করে নিলেন। কেন জানিনা, মনে হল যেন আমাদের তিনজনকেই তিনি পছন্দ করে ফেলেছেন। খুসী হয়ে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, "হুঁ, আপনাদের মাষ্টারমশাই আমাকে আপনাদের কথা বলেছিলেন। চমৎকার লোক কিন্তু আপনাদের মাষ্টারমশাই, উঁচু দরের শিল্পী। কি বলেন?"

উত্তরে আমাদের তিন জনেরই মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হল। ঘণ্টা বাজিয়ে মিঃ ফন্টেন চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। বুক দুরু দুরু করতে লাগল, আমাদের তাড়িয়ে দেবেন নাকি! তবে কি কোন অন্যায় করে ফেললাম? ফ্যাটীও বেশ ঘাবড়ে গেল। ল্যাডিসেক্ চোখ দুটো ছানাবড়া করে ঘরের দামী আসবাবপত্রগুলোর দিকে তাকাতে লাগল। ঘণ্টা শুনে পরিচারিকা ঘরে ঢুকল এবং নাটকীয় ভঙ্গিতে অভিবাদন করে দাঁড়াল। মিঃ ফন্টেন বললেন, "ভদ্রলোকদের চা এনে দাও অ্যানি। বসুন আপনারা।"

এদিক ওদিক তাকিয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। বোধ হয় এরকম চেয়ারে জীবনে এই প্রথম বসলাম। ফ্যাটী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল, ল্যাডিসেক্ তার লম্বা পা জোড়া নিয়ে বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়ল, আর আমি গলা পরিষ্কার করে ধীরে ধীরে মিঃ ফন্টেনের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলাম। মিঃ ফন্টেন নিজেকে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে আবার বললেন, "বাস্তবিক, একজন শিক্ষক বটে। এরকম লোককে আপনারা যে মাথার ওপরে পেয়েছেন এ আপনাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। শিল্পের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, —এ এক বিরাট কাজ। সত্যিই বিরাট,......আর কষ্টসাধ্যও। শিল্পের পথে কাঁটা যে কত তা আমি ভাল করেই জানি।" চুলের ভেতর শুকনো হাতখানা চালিয়ে দিয়ে বলে চললেন, "আপনারা শিল্পী, কঠিন পথ বেছে নিয়েছেন। নিঃস্বার্থ জীবন যাপনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে কিন্তু আপনাদের।"

কথার তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে ফ্যাটী চোখ মিট্ মিট্ করতে লাগল, আর ল্যাডিসেক্ তখন ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। মিঃ ফন্টেন দুঃখ করে জানালেন যে এক এক সময় শিল্পীদের অসমঝদারী আবহাওয়ায় পড়ে বেশ কষ্ট পেতে হয়। আমি হুঁ হ্যাঁ করে তাঁর কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম।

পরিচারিকা প্রকাণ্ড খাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ল্যাডিসেক্ তার হাত থেকে থালা তুলে নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু পরিচারিকা

সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সামনের টেবিলে থালাটা রেখে খাবার সাজাতে লাগল। আমাদের কেউই জীবনে এক সঙ্গে এত খাবার দেখেছি কিনা সন্দেহ। ল্যাডিসেক্ তার কাব্যিক দৃষ্টি নিয়ে ইসারায় পরিচারিকাকে কৃতজ্ঞতা জানাল, ফ্যাটী টেবিলের তলা থেকে পা দিয়ে আমাকে খোঁচা দিল, আর আমি ওদিকে না তাকিয়ে কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলাম।

"নিন্, আরম্ভ করুন" বলে মিঃ ফন্টেন চা ঢালতে লাগলেন। ঢালতে ঢালতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কড়া ?"

সারাদিন কিছুই খাইনি, ফ্যাটীরও দেরী সইছিল না, দু'তিনটে খাবার ইতিমধ্যে মুখে পুরে দিল। ফ্যাটীকে অপেক্ষা করবার জন্যে আমি খোঁচা দিলাম।

মিঃ ফন্টেন নিজের চা ঢেলে নিলেন আর চামচ দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে লাগলেন। লক্ষ্য করলাম, তিনি চায়ে চিনি নিলেন না। আমি তাঁর অনুকরণ করে যাচ্ছিলাম। আমাকে দেখে ফ্যাটীও তার স্যাণ্ড-উইচ্‌টা রেখে চা নাড়তে আরম্ভ করল, প্লেট্ নোংরা হয়ে যাবে এই ভয়ে স্যাণ্ডউইচ্‌টা টেবিলের ওপর রাখল। মিঃ ফন্টেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে চা নেড়েই চললেন আর বর্ত্তমান যুগের শিল্পীদের দুর্দ্দশার কথা আওড়াতে লাগলেন। তারপর একখানা বিস্কুট তুলে চায়ে ডুবিয়ে নিলেন। ফ্যাটী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে একটা বিস্কুট তুলে নিল।

আমার মনে হল, নিশ্চয়ই মিঃ ফন্টেনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছি। এতক্ষণে ল্যাডিসেকের বিস্ময় কেটে গেছে। 'রাম্' দিয়ে চায়ের কাপ ভর্ত্তি করে স্যাণ্ডউইচ্ সহযোগে খেতে আরম্ভ করে দিল, তাকে সাবধান করবার সময় বা সুযোগ পেলাম না। তার এই কাণ্ড দেখে ফ্যাটীও তার পরিত্যক্ত স্যাণ্ডউইচ্‌টা তুলে নিয়ে মুখে পুরল।

মিঃ ফন্টেন ফ্যাটীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন, "তা হলে আপনি হচ্ছেন পিয়ানোবাদক, মিঃ—, মিঃ—?"

ফ্যাটী মহা বিপদে পড়ল। স্যাণ্ডউইচ-ভরা মুখে কয়েকবার ঢোক গিলে অর্দ্ধেকটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মাইক্‌স্‌।"

মিঃ ফন্টেন ফ্যাটীকে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। ল্যাডিসেক কিন্তু চুপ করে বসে নেই, একটার পর একটা স্যাণ্ডউইচ খেয়েই চলেছে।

এবার এল আমার পালা। আমার দেশ কোথায়, বাবার নাম কি, কোন্‌ গান আমি সবচাইতে বেশী পছন্দ করি ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন তিনি আমাকে করলেন। তারপর তিনি ধরলেন ল্যাডিসেককে। ল্যাডিসেক কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল; পিয়ানোর ওপর যে গাঢ় বাদামী রংএর বেহালাটা ছিল সেটা তুলে নিয়ে ওস্তাদের ঢংএ টুং টাং করতে লাগল; বলল, "মিটেন্‌ ওয়াল্‌ডার্‌?" এই সে প্রথম কথা বলল।

সোৎসাহে মিঃ ফন্টেন বললেন, "হ্যাঁ, মাষ্টার ম্যাথ্‌ ক্লোৎএর নিজে হাতে গড়া। দলিলও আমার কাছেই আছে, দেখাচ্ছি আপনাদের, একটু অপেক্ষা করুন।"

আমি ও ফ্যাটী দৃষ্টি বিনিময় করলাম। তাইতো, ল্যাডিসেক আমাদের ওপর টেক্কা দিয়ে গেল!

ইতিমধ্যে ল্যাডিসেক বেহালায় সুর বেঁধে ডি ফ্যালা'র একখানা গান বাজাতে আরম্ভ করে দিল। বাবা, কি চালিয়াতিই না জানে ল্যাডিসেক! মিঃ ফন্টেন দেহটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন। গান শেষ হলে তিনি বললেন, "বেশ!" তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নিজের কোন রচনা আছে?"

কিছুমাত্র ইতস্তত: না করে ল্যাডিসেক আবার বাজাতে আরম্ভ করল। একযোগে তিনটে গদ বাজিয়ে আবার স্যাণ্ডউইচ খাওয়ায় মন দিল।

এবার মিঃ ফন্টেন আমার দিকে তাকালেন। সাহস জড় করে চট করে পিয়ানোর সামনে বসে আমার নিজের রচিত একখানা রাগিণী বাজাতে আরম্ভ

করলাম। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে তখন যেটাকে সম্পূর্ণ নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছিলাম তাতে আমাদের মাষ্টারমশাইয়ের রচিত সুরের প্রভাবই বেশী ছিল।

ফ্যাটী একটা অনর্থ ঘটিয়ে দিয়েছিল আর কি! চমৎকার রাগিণী সে ধরেছিল, কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে সুরটাকে বিকৃত করে তুলেছিল ভয়াবহ রকমের। সুখের কথা, পরীক্ষায় সেও উৎরে গেল, কারণ দোষ ধরতে হলে সমঝদার লোক চাই তো!

যা হ'ক, প্রথম দিনটা ভালভাবেই কেটে গেল। মিঃ ফন্টেন জানালেন যে এখন থেকে তিনি আমাদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি নেবেন। খুব কৌশলে তিনি আমাদের তিনজনের হাতে তিনটী শীলমোহর করা খাম গুঁজে দিলেন। বাইরে গিয়ে দেখলাম প্রত্যেক খামের ভেতর ছুটো করে একশ' ক্রাউনের নতুন নোট। শক্ত করে আমাদের হাত ধরে মিঃ ফন্টেন আমাদের অনুরোধ করে জানালেন যে একমাসের মধ্যে আবার এসে তাঁকে আমাদের নতুন কিছু শোনাতে হবে।

আনন্দে মশগুল হয়ে আমরা বাড়ী ফিরলাম, মনে হল স্বর্গের দ্বার বুঝি আমাদের খোলা! ল্যাডিসেককে যেন একটু বিমর্ষ দেখলাম, পরিচারিকাকে তার মনে ধরেছিল।

একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল। দু'শ ক্রাউন পেয়েও কিন্তু আমাদের অভাব ঘুচল না; কবে ঘুচবে কে জানে?

একমাস বাদে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ রচনা নিয়ে মিঃ ফন্টেন সকাশে উপস্থিত হলাম। রচনা তিনটিই মিঃ বেডা ফন্টেনের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। লেখাগুলো পেয়ে মিঃ ফন্টেন খুব খুসী হলেন এবং নিজেই পিয়ানোতে আমার গানটা তুললেন, গুনগুন করে গাইলেনও। ফ্যাটীর গদটাও তিনি বাজালেন এবং মুন্সিয়ানী ঢংএ মাথা নাড়লেন। লক্ষ্য করলাম, বাজাবার সময় তিনি কোন নিয়ম মেনে চলেন নি অবশ্য কিন্তু গানের সমঝদার

বটে। তারপর ল্যাডিসেক বেহালায় তার গানটা তুলল, আর ঐ সঙ্গে আমি পিয়ানো বাজালাম।

সব শুনে মিঃ ফন্টেন বললেন, "চমৎকার! আমি আপনাদের ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি।"—তারপর সুর যোজনা সম্বন্ধে তিনি লম্বা চওড়া এক বক্তৃতা দিয়ে বললেন, "আপনাদের মাথায় একটা খেয়াল চাপল আর তাই চট করে লিখে বসলেন, আমার মনে হয়, এখানেই আপনারা প্রকাণ্ড ভুল করেন। আমি আপনাদের মত যুবক সুরকারদের দিয়ে বেশ কিছু কাজ করিয়ে নিতে চাই। আমি আপনাদের দক্ষতার প্রমাণ চাই। লিখবার ধরণ যখন সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পারবেন তখন নিজেদের প্রেরণার রূপ দেবেন, এখন নয়।"

গম্ভীর ভাবে মিঃ ফন্টেন কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা, একটা কাজ করুন না কেন? আপনারা তিনজনেই একই বিষয়ে সুর তুলুন। তাহলে আমি আপনাদের আরো গভীরভাবে বুঝতে পারব, এবং সেই ভাবে উপদেশ দিতে পারব।" চুলের ভেতর হাত চালিয়ে আবার বললেন "ধরুন, এই ছোটখাট একটা প্রস্তাবনার মত। সৈন্যদের শিবিরে একটা রাত্রির দৃশ্য......যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রির বর্ণনা! কেমন, বেশ চমৎকার বিষয় হবে, না?"

ক্যাটী চট করে প্রশ্ন করল, "আকাশে নক্ষত্র জ্বলবে?"

চোখের ওপর হাত বুলিয়ে মিঃ ফন্টেন বললেন, "না, ঠিক তা নয়। যেন ঝড় উঠেছে; দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর শিবিরে দামামা বাজছে।"

ল্যাডিসেক জিজ্ঞাসা করল, "কোন দেশীয় সৈন্য?"

—"কেন? তা দিয়ে কি হবে?"

—"সে সব জেনে শুনে যন্ত্রের বন্দোবস্ত করতে হবে তো!"

মাথা নেড়ে মিঃ ফন্টেন বললেন, "ঠিক ধরেছেন। ধরুন, রাজা নেবুচাড্-নেসারের সৈন্যদল! বেশ একটু বিদেশী গন্ধ থাকবে তাহলে, না?"

প্রস্তাবটি ক্যাটীর মনঃপূত হল না, বলল, "ওরা যে মূর্ত্তি পূজো করত!"

মিঃ ফন্টেন আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন? তাতে কি এসে যায়?"

ফ্যাটী বোকা বনে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "কিন্তু ওদের সম্বন্ধে আমরা তো কিছু জানি না। তবে যদি আকাশে নক্ষত্র জ্বলবার ব্যবস্থা করেন তো মন্দ হয় না; বরং ভালই হবে।"

সঙ্গীত বিশারদ মিঃ ফন্টেন বললেন, "শিল্পীরা সব কিছুই কল্পনা করে নিতে পারেন। অবশ্য আমার কথা যে আপনাদের মানতেই হবে তাও আমি বলছি না। এটা আলোচনা মাত্র।"

এবার আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে তিনশ' ক্রাউন জুটে গেল। আর্থিক সচ্ছলতা তবু ফিরে এল না।

মিঃ ফন্টেনের কথামত আমরা রাজা নেবুচাড্‌নেসারের শিবির নিয়ে রচনায় মনোযোগ দিলাম। যে যার খেয়াল অনুযায়ী রচনা করলাম। অবশ্য আকাশে নক্ষত্র না থাকায় ফ্যাটী প্রথমে একটু হতাশ হয়ে পড়েছিল, কারণ তার মতে নক্ষত্রহীন রাত্রি রাত্রিই নয়।

যা হ'ক, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা শেষ করে আমরা তিনজন মিঃ ফন্টেনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বলা বাহুল্য, সঙ্গীত বিশারদ খুব খুসী হলেন। নাকের ডগায় চশমা জোড়া এঁটে বিশেষ মনযোগের সঙ্গে পাতা উল্‌টিয়ে যেতে লাগলেন। ল্যাডিসেকের রচনা পড়ে বললেন, "মন্দ নয়!" আমার ভাগ্যেও মিষ্টি কথা কিছু জুটল। ফ্যাটীর সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন, "ঠিক জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি।"

কথাটা শুনে ফ্যাটীর উৎসাহ দমে গেল, বোকার মত মিঃ ফন্টেনের দিকে তাকিয়ে রইল।

মিঃ ফন্টেন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আমার মনে হয়, গ্রাম্য দৃশ্যাবলিই আপনি ভাল ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। ধরুন, মাঠে একপাল ভেড়া চরছে, আর রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে, তুলেছে প্রেম সঙ্গীত!"

ফ্যাটীকে প্রেমসঙ্গীত লিখবার ভার দিয়ে মিঃ ফন্টেন আমাকে জানালেন

যে যুদ্ধভীতা নারীর বিলাপ—এই ধরনের গান আমার লেখা উচিত, এবং এই কাজ তিনি এখন আমাকে দিচ্ছেন।

সঙ্গীত বিশারদের হাত এবার আরো খুলে গেল; আমরাও উঠে পড়ে লাগলাম তাঁকে সন্তুষ্ট করতে।

ফ্যাটীকে আমি শক্ত করে ধরলাম; প্রেমসঙ্গীতে আমি সিদ্ধহস্ত, অতএব ফ্যাটীর কাজটা আমিই করে দেব কিন্তু তাকে আমার বিলাপের গানটা রচনা করে দিতেই হবে, কারণ ফ্যাটী তাতে পাকা। আর মিঃ ফন্টেনও কিছু বুঝতে পারবেন না।

মিঃ ফন্টেন এবার খুসী হলেন সব চাইতে বেশী। কিন্তু ফ্যাটীর প্রেমসঙ্গীত পড়ে (যেটা তার হয়ে আমি লিখেছি) তার প্রতি তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "গড়েছেন তো নিপুণভাবে, কিন্তু প্রাণ কোথায়?"

ফ্যাটী নিরুপায় হয়ে দোষ স্বীকার করল। মিঃ ফন্টেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি প্রেমে পড়েন নি?"

যেন কি এক মহা অন্যায় করে ফেলেছে এমনিভাবে ফ্যাটী বলল, "না।"

—"ওঃ, মস্ত ভুল করেছেন। শিল্পীকে যে ভালবাসতেই হবে; কোন বাঁধন থাকবে না তার প্রেমে। ডায়নিসসের মত সে ভালবাসবে।"

ঘাবড়ে গিয়ে ফ্যাটীর মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা স্বর বের হল।

মিঃ ফন্টেন আবার তাকে কাজ দিলেন। লিখতে হবে কলসী কাঁধে এক কুমারী মেয়ের সম্বন্ধে; মেয়েটী কুয়োর জল তুলতে চলেছে।

এবার আমার বিষয়বস্তু হল, এক রাজ্য আর এক রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। আর ল্যাডিসেককে দেওয়া হল কোন্ এক রাখাল ছেলে এন্ড্রুণের সঙ্গে কে এক যুড়িথের প্রেমের অবতারণা করতে।

বাড়ীতে গিয়ে প্রেমের ব্যাপারটা আমি রচনা করলাম, আর ল্যাডিসেক যুদ্ধ বিগ্রহ পছন্দ করত বলে আমার কাজ ওকে দিলাম।

লেখাগুলো পেয়ে মিঃ ফন্টেন এবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরবার উপক্রম করলেন। মুরুব্বিয়ানার ঢংএ বললেন, "আপনাদের রচনা আমি যত্ন করে আমার কাছে রেখে দেব। যখন আপনারা খ্যাতনামা গায়ক হবেন তখন এগুলো প্রকাশ করব। আপনাদের উন্নতির প্রতি আমার সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে।"

মিঃ ফন্টেন সত্যি আমাদের আন্তরিক ভালবাসতেন। তাঁর উদারতা আমাদের খুব আকৃষ্ট করত। আমাদের জীবনের খুঁটিনাটি তিনি জানতে চাইতেন, বলতেন, "শিল্পমহলে আপনাদের আমি টেনে আনব। ভদ্র-সমাজে কি করে চলতে হয় তা আপনাদের আমি শেখাব। এমন একদিন আপনাদের আসবে যেদিন হয়ত কোন রাজার সঙ্গে বসে খানা খাবেন, হয়ত কোন রাজকন্যা আপনাদের কারো প্রেমে পড়বে। তাই, রাজার চালে আপনাদের চলতে হবে।"

এসব কথা শুনে ফ্যাটী ভয়ে চোখ মিট মিট করত। রাজকন্যার কথায় ল্যাডিসেকের যেন আর দেরী সইত না।

মিঃ ফন্টেন আমাদের বললেন, "প্রতি সপ্তাহেই আমার এখানে গানের আসর জমে। খ্যাতনামা শিল্পী, জ্ঞানী, সমালোচক তাতে যোগ দেন। ঘরোয়া আলোচনাই বেশী হয়ে থাকে। এসব আলোচনায় উপস্থিত থাকলে ভবিষ্যতে আপনাদের সুবিধে হতে পারে। তাছাড়া, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে! অন্ততঃ ভবিষ্যতের পথটা তো খোলা পাবেন। আচ্ছা, আপনাদের পোষাক পরিচ্ছদ কি রকম আছে?"

বললাম, যে পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছি তাই আমাদের সবচাইতে দামী।

মিঃ ফন্টেন আমাদের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে নাক সিঁটকে বললেন, "না, এতে চলবে না। আপনাদের আমি কিছু পোষাক তৈরী করে দেব। সে সব পরে আপনারা একদিন আমার বাড়ীতে সান্ধ্য-আসরে আসবেন, আর সেখানে আপনাদের রচনাগুলো বাজাবেন। জীবনে একটা পথ পাবেন।"

এই অনুগ্রহটুকু আমাদের করতে পেরেছিলেন বলে তিনি দস্তরমত খুশী হয়েছিলেন। আর নতুন পোষাক পরে তাঁকে একবার দেখা দিয়ে যেতে বললেন।

যথাসময়ে মিঃ ফন্টেনকে আমরা দেখা দিতে গেলাম। ন্যাভিসেক রাস্তার চালে উদাসীনতার ভাব দেখিয়ে এগিয়ে চলল; ফ্যাটীর অবস্থা তখন বড়ই সঙ্গীন, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। আমি মনে করলাম, এবার নিশ্চয়ই আমাদের চাকরী স্থায়ী হয়ে যাবে।

মিঃ ফন্টেন আমাদের ভাল করে লক্ষ্য করলেন, তারপর বললেন, "উঁহু, এতে চলবে না। ভাল জুতো আর টাই পরতে হবে। ভাল করে সেজেগুজে আসছে বৃহস্পতিবার আটটার সময় আপনারা আমার বাড়ীতে আসবেন; আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও আসবেন। আপনাদের যে সব রচনা আমাকে উৎসর্গ করেছেন সেদিন সেগুলো আপনারা বাজিয়ে শোনাবেন।"

বৃহস্পতিবার ঘড়িতে বেলা আটটা বাজল। আর আমরাও ফিটফাট হয়ে মিঃ ফন্টেনের বাড়ীর দরজায় এসে সুইচ্ টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক খানসামা দরজা খুলে দাঁড়াল। ফ্যাটী তো ইষ্টদেবতার নাম জপতে লাগল। কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে ন্যাভিসেক এগিয়ে চলল, যেন বাড়ীতে তার দশটা খানসামা আছে।

খানসামা জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা গায়ক? আসুন, ভেতরে আসুন, আমি সাহেবকে খবর দিচ্ছি।"

একটা ছোট্ট ঘরে সে আমাদের ঢুকিয়ে দিল। ঘরের ভেতর আমরা তিনটি জীব মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে ভেলভেটের একটা জামা গায়ে মিঃ ফন্টেন আমাদের ঘরে ঢুকেই ব্যস্তভাবে বললেন, "এই যে, এসেছেন! আপনাদের জন্যে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"— তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খাবারের থালা হাতে পরিচারিকা হাজির হল, বলল, "আপনাদের

জন্তে।” ল্যাডিসেক একটা স্যাণ্ডউইচ মুখে পুরে তার দিকে একপা দু'পা অগ্রসর হচ্ছিল। চারদিকের ব্যাপার দেখে ফ্যাটীর নিঃশ্বাস আটকে আসছিল; আমিও বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তারপর পরিচারিকা যখন ল্যাডিসেককে জিভ দেখিয়ে বিদেয় হল তখন সে বলল, “দেখ, আমার মনে হচ্ছে—।”

ফ্যাটী ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল, “কি?”

ঘাড় দুলিয়ে ল্যাডিসেক বলল, “বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভাল।”

খানসামা ঘরে ঢুকে বলল, “সাহেব আপনাদের সেলাম দিয়েছেন।”

একটা প্রকাণ্ড ঘরে খানসামা আমাদের নিয়ে গেল। সেখানে মিঃ ফন্টেনের সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা ছিলেন। মিঃ ফন্টেন ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে বললেন, “আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, শার্লোটা।” ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয়ে মনে মনে আত্ম-প্রসাদ লাভ করলাম।

ইতিমধ্যে মিঃ ফন্টেন তাঁর প্রথম অতিথিকে অভ্যর্থনা করলেন। আনন্দে চীৎকার স্বরে বললেন, “আসুন, আসুন! দেখুন, প্রথমেই বলে রাখছি, এ জায়গাকে নিজের বাড়ী বলে মনে করবেন কিন্তু।”—দ্বিতীয়, তৃতীয় অতিথি এলেন। মিঃ ফন্টেন আমাদের ভুলে গেলেন। আমরা তিনজন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিঃ ফন্টেনের চীৎকারে সমস্ত ঘর মুখরিত হয়ে উঠছিল, আর তাঁর স্ত্রী সকলের সঙ্গে হেসে হেসে করমর্দন করছিলেন। একজনের পর একজন অতিথি ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে দু'চারটে কথা বলে পাশের ঘরে চলে যাচ্ছিলেন; বোধহয় সেখানে খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাদের ভয় বেড়েই চলল। কেউই সান্ধ্য-পোষাকে আসিনি, আর আমাদের সঙ্গে কেউ কথাও বলল না।

ভয়-জড়িত সুরে ফ্যাটী জিজ্ঞাসা করল, “আমরা এখন কি করি?”

ফ্যাটীকে খোঁচা মেরে ল্যাডিসেক ফিস ফিস করে বলল, "এই, সরে দাঁড়া। একটু ফাঁক ফাঁক হয়ে থাক্, নইলে আমাদের অবস্থিটা ওরা ধরে ফেলবে।"

ফ্যাটীর বুক দুরু দুরু করে কাঁপছিল, বলল, "কোথায় সরব?"—ওর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, হয়ত ও এক্ষুনি ভেঙে পড়বে। ল্যাডিসেকও ভয়ে ফেকাশে হয়ে গেল। ভয় পেলে ওকে কিন্তু বেশ দেখায়!

এমনি সময়ে মিঃ ফন্টেন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করে পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। চট করে ল্যাডিসেক দু'পা এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা অভিবাদন করে বলে বসল, "নমস্কার! এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি হচ্ছেন সুরকার মাইক্স্।"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। ফ্যাটী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল আর কি! মিঃ ফন্টেন লজ্জায় রাগে লাল হয়ে উঠলেন। কয়েক বার ঢোক গিলে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন মিঃ মাইক্স্—একজন প্রতিভাশালী সুরকার। আর ইনি মিঃ—মিঃ—মিঃ—।"

ল্যাডিসেক চটকরে বলে ফেলল, "প্রচাংকা!"—তারপর নির্লজ্জের মত তার হাতটা ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "পরিচয় করে খুব সুখী হলাম।"

ফ্যাটী ভয়ে পাথর হয়ে গেল, আড়ালে জিজ্ঞাসা করল, "লোকটা কে?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ল্যাডিসেক বলল, "কে জানে!"

মিঃ ফন্টেন ভদ্রলোকটীকে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে আমাদের কাছে ফিরে এলেন। বোমার মত ফেটে গিয়ে বললেন, "মনে রাখবেন, আপনাদের নিমন্ত্রণ করে এখানে আনা হয়নি; আপনারা হচ্ছেন—।"

—"ভাড়াটে গায়ক!"—ল্যাডিসেক কথাটা ধরিয়ে দিল।

মিঃ ফন্টেন সরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে পাশের ঘরের কাজ শেষ করে অনেক লোক আমাদের ঘরে এসে ভীড় করেছেন। ল্যাডিসেক ফিস ফিস করে বলল, "এই, গানের ঘরে চল্।"

গানের ঘরে একটা পিয়ানো আর তার ওপর গাঢ় বাদামী রংএর সেই মিটেন্ওয়াল্ডারটা ছিল। আমাদের হাতে লেখা বেডা ফন্টেনকে উৎসর্গ করা রচনাগুলোও সেখানে ছিল। যেন হাতে স্বর্গ পেলাম, এতক্ষণ পরে তবু কিছু করবার সুযোগ হল। ধৈর্য্য রাখতে পারলাম না। হঠাৎ টুং টাং বেজে উঠল। গতি ক্রমেই বেড়ে চলল। আমি আর ফ্যাটী ধরলাম পিয়ানো, আর ল্যাডিসেক ধরল মিটেন্ওয়াল্ডার; বাজনা পূর্ণোদ্যমে চলল।

গান শুনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দরজায় ভীড় করে দাঁড়ালেন। সবাই তো অবাক,—এ কি কাণ্ড!

আমরা কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলাম না। বরং এমন ভাব দেখালাম যে আদেশ পেলেই নতুন করে বাজাতে পারি। কিন্তু আদেশের আর প্রয়োজন হল না; তার আগেই মিঃ ফন্টেন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "কি হচ্ছে এসব? আপনাদের কি এতটুকু কাণ্ড জ্ঞান নেই?"

থতমত খেয়ে ল্যাডিসেক বলল, "মাফ্ করবেন, বুঝতে পারি নি। আমরা তো ভাড়াটে গায়ক, তাই না?"

বলা বাহুল্য, আধমিনিটের মধ্যেই আমাদের তিনজনকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হল। রাস্তার ফাঁকা হাওয়ায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পরের দিন ভোরে মিঃ ফন্টেনকে আমাদের নতুন পোষাকগুলো পাঠিয়ে দিতে হোল। ল্যাডিস্লেক কিন্তু রাগ করে খানিকটা মোম গালিয়ে পোষাক-গুলোতে লাগিয়ে দিল।

মিঃ ফন্টেনের কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত সব কিছু থেকেই আমাদের বঞ্চিত হতে হল। অবশ্য মিঃ ফন্টেনও আমাদের কাছ

থেকে কিছুই পান নি। ভবিষ্যতে আমরা কেউই সুরকার হতে পারি নি। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ফ্যাটী মাইক্‌স্‌ ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যায়, ল্যাডিসেক প্রচাৎকা রাশিয়ার কোথায়ও উধাও হয়, আর আমি এক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে পচে মরছি।

[ত্রিমূর্তির ইতিহাস]

শ্রীমতী ফল্‌টিনোভার বিবৃতিতে দুজন লোকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; তারা বেডা ফন্টেনের জীবনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। অনিবার্য্য কারণে তাদের ডায়েরী উদ্‌ঘাটিত হয় নি। তবু তাদের কথা না বললে আমাদের নায়কের জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে তাদের সম্বন্ধে এখান ওখান থেকে যা জানা গিয়েছে তাই লিপিবদ্ধ করা হল।

প্রথমটী হচ্ছে সেই বিদেশী গায়িকা যার কথা শ্রীমতী ফল্‌টিনোভা একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। এককালে সত্যিই সে নাট্যজগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল, এবং সেই সময়ে তার নাটকীয় খেয়াল, তার ভালবাসা, তার গোপনীয় জীবন ইত্যাদি নিয়ে আজগুবি অনেক গল্প শোনা যেত। আমাদের আখ্যায়িকায় যখন সে স্থান পেল তখন তার খ্যাতি লুপ্ত হবার পথে। বয়স তখন তার পঞ্চাশের কোঠায়, আর বেডা ফন্টেনের তিরিশের কাছাকাছি। বুড়ো বয়সেও গায়িকাটির দেহ সৌষ্ঠব ছিল; বিশেষ করে, তার অভিনয় তখনও লোককে আকৃষ্ট করতে পারত।

সহরের এক রঙ্গমঞ্চে এক বিশেষ অভিনয়ে সে অবতীর্ণা হল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বিশ্রামের সময় আমি বেডা ফন্টেনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন লাগছে ওকে?"

মুখ বিকৃত করে ফন্টেন বলল, "ভাল নয়; বয়স হয়ে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তা হয়েছে বই কি! তবে দিন তারও একদিন গিয়েছে, মশাই। ঐ যে, যখন সে অমুকের রক্ষিতা ছিল।"—একজন নামজাদা হুরকারের নাম উল্লেখ করলাম, অবশ্য তিনি বিশবছর আগে মারা গিয়েছেন।

চোখ ছানাবড়া করে ফন্টেন জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি? আশ্চর্য্য! আপনি তা কি করে জানলেন?"

আমি উত্তর দিলাম "কেন? সবাই জানে! তাছাড়া, আরো অনেকে তো ওকে দেখেছিল।" খ্যাতনামা লেখক, রাজপুরুষ, জমিদার ইত্যাদি কয়েকজনের নাম আমি চটাপট বলে দিলাম। হাঁ করে ফন্টেন আমার কথাগুলো গিলছিল। চোখ মুখ তার আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "তাহলে সত্যিই সে অসামান্যা শিল্পী। ওর সঙ্গে আমার আলাপ করতে হবে দেখছি।

এর পরে লক্ষ্য করলাম, ফন্টেন পাশের দর্শকদের কাছে পাগলের মত গানের প্রশংসা করতে লাগল, উচ্ছ্বাসের বশে বহুক্ষণ পর্যন্ত হাততালি দিল। তারপর অভিনয় শেষে মঞ্চের পাশে গায়িকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

দু'দিন পরে শুনলাম, সহরের রঙ্গমঞ্চের এক চুক্তি ভেঙ্গে গায়িকাটি ফন্টেনের সঙ্গে আল্‌প্‌স্‌ অঞ্চলে কোথায় ভেগেছে। তিন দিন পরে বেডা ফন্টেন হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির হল। চেহারা দেখে বুঝতে বাকী রইল না যে এ'কদিন তাকে বেশ অশান্তির ভেতর দিন কাটাতে হয়েছে। অনুনয়ের সুরে সে বলল, "দয়া করে আমাকে আপনার এখানে দু'একদিন থাকতে দিন; আমি এখন বাড়ী যেতে চাই না।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আমি বললাম, "ও, তাহলে বুড়ী ভেনাস আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছে?"

আমার কথায় ফন্টেন দস্তুরমত অপমান বোধ করল, বলল, "আপনি কি বলতে চান? মেয়েটা আমার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছে। ও আবার আমার কাছে এলো বলে, এ আমি বলে দিলাম। কিন্তু আমি ওকে ধরা দেব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ধরাই যদি না দেবেন তবে ওর সঙ্গে পালিয়েছিলেন কেন?"

ঠোঁট দুটো তার কাঁপছিল, বার কয়েক ঢোক গিলে বলল, "কারণ······ কারন আমি ভেবেছিলাম হয়ত ওর ভেতর কিছু প্রতিভা আছে। আপনিই

তো ওর সম্বন্ধে কত কথা আমাকে বলেছিলেন। কত লোক নাকি ওর প্রেমে পড়েছে।"

প্রায় এক সপ্তাহকাল ফন্টেন আমার বাড়ীতে ছিল। তার কথাবার্ত্তার ফাঁকে যে সত্যি কথাটা উঁকি মেরেছিল তা এই,—

—উল্‌ফ্‌গ্যাংসির পাশে কোন্ এক জায়গায় ফন্টেন ঐ বিদেশিনীর জন্যে এক বাড়ী ভাড়া করেছিল। কিন্তু প্রথম রাত্রেই দুজনের ভেতর তুমুল তর্কের ফলে তার সমস্ত কল্পনা ভেঙ্গে যায়; রাগের আতিশয্যে গায়িকা ফন্টেনের উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা কাঁচ ছুড়ে তার গলার খানিকটা কেটে দেয়। পরের দিন ভোরেই বিদেশিনী ইতালি অভিমুখে রওনা হয়, ফন্টেনও ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনায় ফন্টেনের জন্যে আমার বড্ড দুঃখ হয়েছিল। কামের বশবর্ত্তী হয়ে সে এই কাণ্ড করেছিল বলে আমার মনে হয় না। এক আধ্যাত্মিক প্রেরণা এর ভেতর লুকিয়ে থাকা মোটেই আশ্চর্য্য নয়। কারণ তাকে আমি বলেছিলাম যে এই গায়িকা একজন খ্যাতনামা সুরকারের এবং আরো অনেক শিল্পীর রক্ষিতা ছিল, এবং হয়ত ঐ শিল্পীদের সঙ্গে নিজের নামটাও জুড়ে দেওয়ার আকাঙ্খা সে করেছিল। ঘটনাটা একটু পুরোনো হলে সে সবাইকে তার গলার ক্ষতটা দেখিয়ে রহস্যে জড়িয়ে বলত, "প্রতিহিংসার স্মৃতি!" গায়িকাটি যে একদা এক বিখ্যাত সুরকারের রক্ষিতা ছিল সেকথাও প্রচার করতে সে ভুলত না। এমনি করে ফন্টেন নিজেকে শিল্পীর আসনে বসাতে চেষ্টা করেছিল। আমাকেও সে তার গলার ক্ষতটা দেখিয়ে তার অভীষ্ট সাধনে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফন্টেন জানত না যে সত্যি ঘটনার খানিকটা আমি আঁচ করিতে পেরেছিলাম।

* * * *

আর একজন হচ্ছে অন্ধ ক্যানার; তার কথাও শ্রীমতী ফল্‌টিনোভা বলেছেন। তার পুরো নাম ল্যাডিস্লাভ্ ক্যানার। এখন অবশ্য সে নিরুদ্দিষ্ট

একদা এককালে সঙ্গীত মহলে সে বিশেষ পরিচিত ছিল, এবং প্রাগের নৈশ ও ...কলময় জীবনে সে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। এই অন্ধ গায়কটী কোথায় গান শিখেছিল, কার ছাত্র—কেউ জানে না। সঙ্গীত বিদ্যালয়কে, ...শেষ করে, শিক্ষিত ভদ্র গায়কদের সে ঘৃণা করত। মেজাজ ছিল তার বড্ড ...ক রোখা—গোঁয়ার। মাথায় প্রকাণ্ড এক টাক বয়ে সে চলত। খুব বেঁটে ছিল সে, তার ওপর ছিল জঘন্য নোংরা—সবে মিলে তাকে দেখাত অদ্ভুত। ...ক নগণ্য পল্লীতে তার চেয়েও এক নগণ্য কাঠের বাড়ীতে সে থাকত। ঘরে পিয়ানো অথবা অন্য আসবাবপত্রের বালাই ছিল না। কি করে যে তার অন্নবস্ত্র জুটত তা কেউ জানত না। রাত গভীর হলেই তাকে দেখা যেত কোন নিকৃষ্ট রেঁস্তোরা অথবা ঐ শ্রেণীর কোন নোংরা জায়গায়;—অবশ্য সেখানে এক বিশালদেহী পরিচারিকা এবং ভাঙাচুরো একটা পিয়ানো থাকা চাই। মদখেয়ে চুর হয়ে সে কখনো প্রলাপ বকত, কখনো বা পিয়ানো বাজাত। মাঝে মাঝে রাগে আর ঘৃণায় সে তার অভিহিত 'শিক্ষিত ভদ্র' গায়কদের রচনা ব্যঙ্গ করে বাজাত। নিজের খেয়ালে যখন যা খুশী বাজাত কিন্তু কখনো পরের গানে হাত দিত না। কেউ যদি তাকে বলত, "ক্যানার, ওমুক গায়কের ঐ রাগিণীটা বাজাও তো," ওমনি সে তার হলদে দাঁতগুলো বের করে বলত, "পরের গান ক্যানার বাজায় না।" কেউ যদি তাকে বলত, "ক্যানার, এই পৃথিবীর ওপর ঘৃণা ধরে গিয়েছে, মন বিষিয়ে উঠেছে,—একটা কিছু বাজাও," —ওমনি সে খুসী হয়ে বাজাতে আরম্ভ করত।

আমি গায়ক নই কিন্তু গান আমি খুব ভালবাসি। তাই একদিন আমি এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞকে এক নোংরা নৈশ আড্ডায় নিয়ে যাই। সেখানে ক্যানার দৈনন্দিন নিয়মানুযায়ী এক ভাঙা পিয়ানো বাজাচ্ছিল। বাজনা শুনে সঙ্গীতজ্ঞ আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, "অদ্ভুত! লোকটা হয়ত জানেও না যে কি বাজাচ্ছে।.........চুপ!"

ক্যানারের বাজনা শুনে ক্রমেই তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। অবশেষে

লাফিয়ে ক্যানারের সামনে গিয়ে তার হাতে এক হাজার ক্রাউনের এক খানা নোট গুঁজে দিয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "ওরে হতভাগা, এসব গান ছেড়ে এমন গান বাজাও যাতে তোমার প্রতিভা স্পষ্ট ফুটে ওঠে।"

ক্যানার উঠে দাঁড়াল, রাগে তার হাত পা কাঁপতে লাগল। ভয় হোল, হয়ত সে এক্ষুনি ভদ্রলোকের টুটি চেপে ধরবে। কিন্তু তা সে করল না, একপা পেছিয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল, "ক্যানার তা বাজাবে না, ক্যানার বাজাবে না।"

ক্যানারের জামাটা শক্ত করে ধরে সঙ্গীতজ্ঞ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "ক্যানার!"

ধমকে কাবু হবার মত লোক ক্যানার নয়। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল, "আমি আপনাকে চিনি!" ভদ্রলোকের নাম বলে দিল।

সঙ্গীতজ্ঞ বললেন, "বেশ, বল এবার থেকে তুমি ঠিকমত বাজাবে?"

কাতর ভাবে ক্যানার উত্তর দিল, "মাফ করবেন, আমাকে মাফ করবেন, আমি পারব না।"

সঙ্গীতজ্ঞ সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন?"

ক্যানার কাঁপছিল, বলল, "আমি কি মানুষ! আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি পারব না।"

ক্যানার তার ঘোলাটে ঢেলা ঢেলা চোখ দুটো সামনের দিকে নিবদ্ধ রেখে বিরবির করে কি যেন বলে চলল।

—"আজ আমি তোমাকে গান বাজিয়ে শোনাব, ক্যানার,"— এই বলে ভদ্রলোক পিয়ানোর সামনে বসলেন। একটা রাগিণী বাজিয়ে একটু থেমে বললেন, "মনে পড়ছে, ক্যানার?" ক্যানার টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ে আঙুল দিয়ে কপালে টোকা দিতে দিতে কাঁদ কাঁদ সুরে বলল, "আমি এসব কিছু বুঝিনা, আমাকে ছেড়ে দিন।"

কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্র নন। এক অভিশপ্ত আত্মাকে উদ্ধার করবার জন্যে তিনি এক রাগিণী ছেড়ে আর এক রাগিণী ধরছেন; শয়তানকে

তিনি আজ তাড়িয়ে দেবেন নিশ্চয়ই। সমস্ত মন প্রাণ তিনি আজ ঢেলে দিয়েছেন ঐ হতভাগ্য ক্যানারের মুক্তির উদ্দেশ্যে। সত্যি, এর আগে আমি তাঁকে কোনদিন এত গভীরভাবে ভাবতে দেখিনি।

—"ক্যানার, মনে পড়ে এটা? আর এটা? হ্যাণ্ডেলকে মনে আছে?……… বাচ্‌কে?……দাঁড়াও, শেষ করে নিই। ………কেমন, বুঝছ?……শুনছ?" —গানের ফাঁকে তাঁর মনের গভীর থেকে এই কথাগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল। ……ক্যানারের মুখে চোখে হতাশার ছাপ সুস্পষ্ট।

ভোর হোল। সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে বাড়ী ফিরলাম, হতাশার ছাপ তাঁরও চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। আক্ষেপের সুরে তিনি বললেন "অদৃষ্ট আর কাকে বলে! আমার সমস্ত হাতে যত গান রয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী আছে ওর এক আঙ্গুলে।"—তিনি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি, কারণ আমি জানি তিনি তাঁদের একজন নন যাঁরা নিজেদের ছোট ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

* * * * *

ক্যানারের চরিত্র সম্বন্ধে পাঠক কিছুটা অবগত হবেন এইজন্যেই এই ঘটনার অবতারণা করলাম। চরিত্রের দিক থেকে বিচার করতে গেলে বেড়া ফন্টেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব খুবই অদ্ভুত বলে মনে হয়। সভ্যতার কঠিন শেকলে বন্দী ফন্টেনের খুঁতখুঁতে স্বভাব, ভাবধারার সঙ্গে ক্যানারের ছন্নছাড়া জীবনের যে কোনক্রমেই আপোশ চলতে পারে না একথা পাঠককে নতুন করে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। অথচ এক সময় শুধু আপোশ নয়, এদের বন্ধুত্ব ছিল উৎকট ধরণের। ক্যানার যে সব নিকৃষ্ট রেঁস্তোরাতে আড্ডা মারত প্রায়ই দেখা যেত সেখান থেকে ফন্টেন তাকে গাড়ী করে বাড়ী নিয়ে আসছে। ফন্টেন সবাইকে জানিয়ে দিল যে

ক্যানারের ভেতর যে সব নৈতিক বৃত্তি ও শিল্পপ্রতিভা পচে মরছে সেগুলো বাইরের আলোতে প্রকাশের ভার নিয়েছে সে নিজে। কতটা কৃতকার্য্য হয়েছিল তা সেই জানে, তবে ক্যানারের সান্নিধ্যে তার যে পরিবর্ত্তনটি লক্ষ্য করবার বিষয় তা হচ্ছে ছন্নছাড়া জীবনের প্রতি এক উৎকট আসক্তি। ক্যানারের জীবনের সঙ্গে সে তাল মিলিয়ে মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকত; খাপছাড়া চালচলন আয়ত্ব করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। ওঃ, সে কি দুরন্ত প্রয়াস!

শিক্ষিত ভদ্রগায়কদের ঘৃণা করত বলে ফন্টেন ক্যানারকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত। ক্যানারের বুকে দু'চাপর মেরে বলত, "তোমার গান আছে এখানে, একাডেমির প্রশংসাপত্রে নয়। এই সব তথাকথিত পণ্ডিতদের আমরা একদিন তাক লাগিয়ে দেব, তুমি নিশ্চয়ই জেনো ক্যানার!"—চোখ দুটো পাকিয়ে বলত, "গানেই আমাদের মেতে থাকতে হবে। সৃষ্টির ভেতর রয়েছে মাদকতা।"—ক্যানার এসব ধোঁয়াটে কথার বড় একটা ধার ধারত না, শুধু মাথা নেড়ে যেত।

কেন যে তাদের ভেতরে বিচ্ছেদ হোল তা আমার জানা নেই। এক দিন হঠাৎ ফন্টেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়;—ঠিক সেই সভ্যভব্য ভাব, এক চোখে চশমা আঁটা, গা দিয়ে মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। ক্যানারের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে নাক সিট্‌কে ভুরু কুঁচকে বলল, "ওকে নিয়ে চলা অসম্ভব, কিচ্ছু হবে না ওর। ওর ভাল করতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু......।"—হাতটা অদ্ভুত ভাবে নেড়ে ক্যানার-প্রসঙ্গ সে শেষ করল।

এরপর একদিন আবার ক্যানারের সঙ্গে আমার রাস্তায় দেখা হোল। মাতাল হয়ে রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে যাচ্ছিল সে। ফন্টেনের কথা তুলতেই জড়িয়ে জড়িয়ে সে বলল যে ফন্টেন নাকি ছোরা দিয়ে তাকে খুন করতে গিয়েছিল। তার অস্পষ্ট কথার ভেতরে 'যুডিথ,' 'যুডিথ' কি যেন শুনলাম। জড়িত কণ্ঠে সে বলল, "আর যাই হোক, যুডিথ আমার। এতে তার

কোন অধিকার নেই, কোন অধিকার নেই।......ওর টাকা কে চায়?" —রাগে ঠোঁট কামড়ে সে বলে চলল, "তাকে আমার কথা বলবেন। বলবেন, যুডিথকে সে পাবে না, আমি তাকে দেব না।"

ভাবলাম, কন্টেন তার যে গীতি-নাট্যের কথা চারদিকে প্রচার করে বেড়িয়েছে ক্যানার হয়ত সে কথাই বলছে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল এক কুৎসিত স্ত্রীলোকের কথা—একটা হোটেলের ঝি ক্যানার আর কন্টেনের দুজনেরই সেই হোটেলে যাতায়াত ছিল। তারা আদর করে স্ত্রীলোকটির নাম দিয়েছিল যুডিথ। আমার মনে হয় তারা দুজনেই এই যুডিথটার পেছনে লেগেছিল। ক্যানার নাকি তাকে ভালবাসত। একদিন আমি ক্যানারকে 'যুডিথের গান' নামে এক রাগিণী বাজাতেও শুনেছিলাম। হয়ত এই যুডিথকে নিয়েই তাদের ভেতর মনোমালিন্য হয়। কিন্তু শ্রীমতী কন্টিনো ভার ডায়েরী অনুযায়ী বর্ত্তমান লেখকের প্রথম অভিমতটাই সত্যি বলে মনে হয়।

আগেই বলেছি এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ক্যানার নিরুদ্দিষ্ট হয়। কিছুদিন যাবত তাকে আর নৈশ আমোদপুরীতে দেখা যেত না, এবং সবাই যখন তার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হোল তখন তাকে খুঁজে পাওয়ার আর কোন আশাই ছিল না। এমনি করে ক্যানার বিস্মৃতির গর্ভে চিরকালের জন্যে ডুবে গেল। প্রত্যেক যুগেই ক্যানারের মত অদ্ভুত স্রষ্টা দু'একজন থাকে। অন্ধ পাগল গায়ককে কেউ জানল না, কাউকে দু'নবার অবকাশ না দিয়েই সে অদৃশ্য হোল। তার সমসাময়িক যুগেও সে কারো মনে এতটুকু স্থান পেল না।

[সঙ্কলন]

[৯]

স্বর্গতঃ ফণ্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয় এবং ব্যবসায়ের খাতিরেই তা হয়েছে। আমি তখন এক নাট্যশালার সঙ্গীত পরিচালক ছিলাম। একদিন তিনি আমার কাছে এসে 'যুডিথ' নামে তাঁর এক গীতি-নাট্যের যন্ত্রসঙ্গীতে সাহায্য করতে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁর কথাবার্তায় জানলাম যে ছেলেবেলা থেকেই গানের ওপর তাঁর অনুরাগ বড্ড বেশী ছিল, এবং তখন থেকেই কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে তিনি গানের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। কোনদিনই কোন নিয়ম মেনে তিনি চলেন নি, কোন সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পড়বারও তাঁর অবকাশ হয়নি। তিনি বললেন, "আমার ভেতর সঙ্গীতের চেয়ে কাব্যপ্রতিভাই বেশী আছে। যুডিথের বিষয়বস্তু আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম শুধু নাটকটাই লিখব, কিন্তু আমার অজান্তে প্রতিটী দৃশ্যে এক একটা সুর এসে আমার মন দখল করে বসল। এমন কি, যেখানে শুধু কথা বলবার প্রয়োজন ছিল সেখানেও কথাগুলো সুরের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেল। অগত্যা—!"—নিরুপায়ের ভাব দেখিয়ে ফণ্টেন ঘাড় দুলিয়ে নিলেন। আবার বলে চললেন, "প্রথম থেকেই গীতি-নাট্য হিসেবে এটা লেখা উচিত ছিল। কিন্তু কি করি! সুর যে আপনা আপনিই এসে পড়ল। আমি রচনা শেষ করেছি; এখন যে কি করতে হবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আর দেখুন, দু'একটা বিষয়ে আমি আমার দীনতা স্বীকার করছি ;—এই ধরুন—অর্কেষ্ট্রা। ওটা আমি খুব ভাল জানি না। শিল্পের এই কৌশলটা কিন্তু আমাকে আপনার একটু ধরিয়ে দিতে হবে।"

আমি বললাম, "দেখুন, শিল্পে 'বিশেষ কৌশল' বলে কিছুই নেই, আগাগোড়াই একটা বিরাট কৌশল এবং সমস্তই সেই শিল্পকলারই অন্তর্গত।"

মাফ চাইবার ভঙ্গিতে তিনি উত্তর দিলেন যে তিনিও অনেকটা ঐরকমই বলতে চান অর্থাৎ সঙ্গীতের নিয়মকানুন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ—বিশেষই বা কেন—মোটেই সজাগ নন। তাই তিনি এসেছেন এ বিষয়ে আমার কাছে সাহায্য পাবেন এই আশায়।

কথা শেষ করে ফন্টেন আমার দিকে অগ্রিম কিছু দক্ষিণা বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বদান্যতায় বেশ আশ্চর্য্য হলাম, বললাম, "আপনাকে নিরাশ করতে হোল, মিঃ ফন্টেন। আমি শিক্ষক, কণ্ঠসঙ্গীতই আমার বিষয়। যন্ত্রসঙ্গীতের জন্যেই আপনি যদি এখানে এসে থাকেন তবে আমি আপনাকে অন্য কারো কাছে যেতে বলছি, কারণ ওতে আমি বড্ড কাঁচা। কণ্ঠসঙ্গীতই আমার যথেষ্ট। আমি বরং আমার বিষয়ে আপনাকে পড়াতে পারি।" —এবং সেই বাবদ আমি কত দক্ষিণা নিয়ে থাকি তা তাঁকে জানিয়ে দিলাম।

উত্তরে ফন্টেন বললেন, "আপনার সাহায্য পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। গায়ক হিসেবে বাজারে আপনার সুনাম যথেষ্ট। আমি আপনার কাছে শিল্পের সেই শৃঙ্খলাটাই জেনে নিতে চাই। আমার সুরের পেছনে বড় বেশী বিপ্লবের ছাপ এসে পড়ে। আর, আমার প্রকৃতিটাই কেমন যেন খাপছাড়া,—স্বীকার না করে উপায় নেই। দেখুন, আমার ভেতর প্রেরণার অভাব নেই, কিন্তু সেগুলো প্রকাশ করতেই সমস্ত শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলি।"

আমি বললাম, "এটা ভাল লক্ষণ নয়, এই দোষটা সংশোধন করুন। বেশ, আমি আপনার গীতি-নাটটি পড়ব। কিন্তু মাফ্ করবেন, বাইরের কোন জিনিষ আপনার ভেতর ঢোকাতে আমি পারব না!"—একটু থেমে আবার বললাম, "বাইবেলের ঘটনা নিয়ে লিখেছেন, কাজটা মোটেই সহজ নয়, মিঃ ফন্টেন। আমিও কিছুদিন বাইবেল নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম। আমি জানি কি কষ্ট এতে হাত দেওয়া! বড় কঠিন, বড় শক্ত!"

ঠিক হোল ফন্টেনের বাড়ীতে আমি যাব এবং তিনি তাঁর যুডিথ থেকে কিছু কিছু অংশ আমাকে বাজিয়ে শোনাবেন। তারপর যা করবার করব।

ঠিক সময়মত ফন্টেনের বাড়ীতে পৌছুলাম। সাদরে অভ্যর্থনা করে তিনি আমাকে বসতে দিলেন এবং যুডিথের আসল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। বাধা দিয়ে আমি বললাম, "এভাবে না করে আপনি প্রথমে গল্পের সারাংশটা বলে তারপর এক একটা করে পংক্তি আমাকে বাজিয়ে শোনান।"

—"বেশ! প্রথমে হচ্ছে বেথুলিয়ার দ্বারে একটি প্রস্তাবনা। মনে করুন, একটি গ্রাম্য দৃশ্য—মাঠের মাঝে এক রাখাল ছেলে তার বাঁশীতে প্রেমসঙ্গীত তুলেছে। সবে ভোর হয়েছে, যুডিথ কলসী কাঁখে জল তুলতে যাচ্ছে।"

—"সদর দরজার বাইরে? এখানেই আপনি ভুল করছেন। কুয়োটা থাকা উচিত সহরের সীমানার মধ্যে, সদর দরজার বাইরে নয়।"

প্রতিবাদ করে ফন্টেন বললেন, "তাতে কি এসে যায়! এখানে ইতিহাসই তো প্রধান নয়, প্রধান হচ্ছে গান।"—একটু থেমে আবার বলে চললেন, "তারপর অসংখ্য ভেরী বেজে উঠল, তার মাঝে শোনা গেল হেলোফারনেসের ঘোষণা—সমস্ত বেথুলিয়া নগরীকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করা হচ্ছে। কিন্তু নগরী সে আদেশ মেনে নিল না। শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল, আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কায় মেয়েরা ভীতা হয়ে উঠল। এই হচ্ছে প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু।"

আমি বললাম, "এখন তবে বাজান। গানের পক্ষে এই যথেষ্ট।"

নির্ভুল না হলেও নিপুণ ভাবে ফন্টেন বাজিয়ে গেলেন। কুয়োর সামনে মেয়েটির দৃশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বাজনা থামিয়ে বললেন, "এখানে আমি আপনার সাহায্য চাই। গ্রাম্য আবহাওয়া থেকে যুদ্ধের ভীষণতায় যে কি করে যাব তাই বুঝে উঠতে পারছি না।"

—"আপনাকেই তা বুঝে নিতে হবে। ওখানে কি হচ্ছে তা তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। বাজিয়ে যান।"

খানিকটা বাজালেন, তারপর আবার থেমে বললেন, "সমস্ত নগরী হেলোফারনেসের আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।"—পিয়ানোতে কয়েকবার হাত চালিয়ে বললেন, "তারপর মেয়েদের বিলাপ।"

সবটা শেষ হতে ১৮ মিনিট লাগল। আমি বললাম "এতে চলবে না, মিঃ ফন্টেন। ঐ লেখাটা ছিড়ে ফেলুন, নতুন করে আরম্ভ করুন।"

যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। কয়েকবার ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, খারাপ হয়েছে কি?"

—"খুব ভাল হয় নি। আমাকে মাফ্ করবেন, সত্যি কথাটা না বলে পারলাম না। মাঝে মাঝে মন্দ হয় নি, কিন্তু সব দিক থেকে বিচার করতে গেলে কিছুই হয় নি।"—দৃশ্যাদি উল্লেখ করে অসংলগ্ন ভাবধারার অবতারণা যা করেছেন তাও বললাম, সেগুলোর দোষ ধরিয়ে দিলাম। অবশেষে বললাম, "সত্যি বলতে কি মিঃ ফন্টেন, আপনার অবস্থায় পড়লে আমি এসব চর্চ্চা ছেড়ে দিতাম। গীতিনাট্য শুধু কথা বা শুধু সুর নয়। বহুর মিলনে এই শিল্পের সৃষ্টি। কলসী কাঁখে মেয়েটিকে অথবা যুদ্ধভীতা মেয়েদের নিয়ে আপনি গান রচনা করতে পারেন বটে, কিন্তু এদের অসংলগ্ন মিলনে খিচুড়ী ছাড়া আর কিছুই হয় না। এর বেশী আর আপনাকে বলবার নেই।"

ফন্টেন আমার কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শুনছিলেন আর মাঝে মাঝে পিয়োনোয় টোকা দিচ্ছিলেন। আমার কথা শেষ হলে গলা ভারী করে তিনি বললেন, "আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন, আমার ভেতরে অনেক কিছু আছে, কিন্তু প্রকাশ অথবা পরিবেশনের ক্ষমতা বোধ হয় আমার নেই।"—বুঝলাম আর বলতে পারছিলেন না, গলা আটকে আসছিল। পিয়ানো ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পেছনটা দেখেই বুঝলাম তিনি কাঁদছেন।

অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করছিলাম, বললাম, "ওকি হচ্ছে মিঃ ফন্টেন? আপনি কাঁদছেন? ছি ছি ছি! এ বড্ড ছেলেমানুষী। শিল্পতো আর খেলনা নয় যে তার জন্যে কাঁদতে হবে। সৃষ্টির সময় মানুষ নিজেকে কেন তার সৃষ্টির সামনে এনে দাঁড় করাবে? আপনার ভেতরে কি আছে তা দেখবার চেষ্টা করা আপনার কখনও উচিত হবে না, শুধু দেখবেন আপনি আপনার মন থেকে কি সৃষ্টি করেছেন। আপনি যদি সত্যি গীতি-নাট্য লিখতে চান তো লিখুন। তা না করে যদি এখন ছোট্ট ছেলের মত কাঁদতে বসেন তাহলে···তাহলে আমি আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকব না। এ কিন্তু মোটেই ভাল হচ্ছে না, মিঃ ফন্টেন। শিল্পই কর্ম্ম। শিল্পসৃষ্টি কর্ম্ম ছাড়া কিছুই নয়। আসুন, বসুন, ধরুন পিয়ানো! গ্রাম্য দৃশ্যটা আবার বাজান তো!"—তাড়াতাড়ি দু'একটা নিয়ম কানুন বলে দিলাম।

ছোট ছেলের মত কাঁদবার পরে নাকটা মুছে ফন্টেন পিয়ানোর সামনে বসলেন এবং পিয়ানোর ওপর অন্ধের মত হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন। অসহায় ভাবে বললেন, "আমি আজ বাজাতে পারছি না, আপনি আমাকে দেখিয়ে দিন।"

আমি চট্‌করে কিছু ভাবতে পারি না, তবু এখানে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হোল,—আমাকে বাজাতে হোল। আমার বাজনা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন ফন্টেন। আবেগভরে বলে ফেললেন, "বাঃ, বেশতো! আচ্ছা, এর পরে কি রকম হবে?"

—" এখন আপনি একবার চেষ্টা করুনতো!"—আমি পিয়ানো থেকে সরে এলাম।

আমার গদটা হুবহু তিনি বাজিয়ে গেলেন। সত্যি, গানে যে ফন্টেনের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

আমি সহজভাবে বললাম, "কিন্তু এতে তো আর আপনার চলছে না, আমার গদটাই তো আপনি নকল করলেন। এখন আপনি কিছু তৈরী করে নিন।"

কপাল কুঁচকে ফন্টেন আবার আরম্ভ করলেন কিন্তু যা দাঁড়াল তা প্রথমবারের চেয়ে এমন কিছু নতুন নয়;—ভুলের অন্ত নেই। মাথা নেড়ে আমি আমার অননুমোদন জানিয়ে দিতে দ্বিধা করলাম না। গান থামিয়ে তিনি বললেন, "মাফ করবেন, প্রেরণাটা ঠিক আসছে না।"

আমি চটে গিয়ে বললাম, "প্রেরণার কোন প্রয়োজন নেই আপনার। গান হচ্ছে পুরোপুরি বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই আপনাকে চলতে হবে। প্রেরণার কোন স্থান নেই এখানে।"

আমার কথা শুনে বিরক্ত হয়ে ফন্টেন বললেন, "আমি তা পারব না। রক্তমাংস ছাড়া আমি সৃষ্টি করতে পারি না।"

—"খুবই নিরাশার কথা। তাহলে আমি আপনাকে কিছু শেখাতে পারব না, মিঃ ফন্টেন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠব, লক্ষ্য করলাম ফন্টেনের চোখে জল। হতাশার সুরে তিনি বললেন, "আমি তাহলে কি করব? যুডিথ যে আমাকে শেষ করতেই হবে।"

বড্ড দুঃখ হোল ফন্টেনের অবস্থা দেখে। নরম সুরে বললাম, "শুনুন মিঃ ফন্টেন। আমি আপনার রচনাটা খুব ভাল করে পড়ব, ভুল দেখিয়ে দেব, অভিজ্ঞ সুরকার সে জায়গায় কি করতেন তাও বলে দেব। তারপর আপনি নিজে নতুন করে লিখবেন, কি বলেন?"

আমার প্রস্তাব ফন্টেন সাদরে মেনে নিলেন, তাঁর বাড়ীতে আমার যাতায়াতও চলতে লাগল।

* * * *

ফন্টেনের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা বিশদভাবে লিখবার কতকগুলো কারণ আছে। প্রথমতঃ, ওপরের এই কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে গানের

প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অসীম এবং গীতি-নাট্য রচনার কল্পনায় তিনি মশগুল হয়েছিলেন। তাঁর এই স্বপ্নের মাঝে কেউ এসে দাঁড়ালে জানালা দিয়ে ঝাপ দিতেও তিনি হয়ত ইতস্ততঃ করতেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই কথাবার্ত্তায় প্রমাণিত হচ্ছে তিনি এক সখের শিল্পী, নিজে নিজেই গান শিখেছেন। তাই সঙ্গীত বিত্থালয়ের অতি সাধারণ ছাত্রও যে রাগিণীগুলো সহজেই আয়ত্ব করতে পারে, সেগুলো পিয়ানোতে তুলতে গিয়ে তাঁকে বেশ নাজেহাল হতে হয়েছে। তৃতীয়তঃ, তাঁর কয়েকটি রাগিণী পিয়ানোতে শুনেই বুঝেছিলাম যে তাঁর প্রতিভা আছে যথেষ্ট কিন্তু বিশেষ কারণে তা কাজে লাগাতে পারেন নি।

প্রথম পরিচয়ের দিনই বুঝতে পেরেছিলাম যে ফন্টেনের সঙ্গে আমার খাপ খাওয়ানো অসম্ভব। তিনি সেই শিল্পীসম্প্রদায়ের একজন ছিলেন যাঁরা শিল্পকে আত্মপ্রকাশের হাতিয়ার বলে চালাতে চান, সংযমের বালাই নেই যাঁদের একবিন্দু—শুধু বেপরোয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করে থাকেন। তাঁদের এই ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী আমি, কারণ ব্যক্তিগত সব কিছুকেই আমি শিল্পের কলুষিত অভিব্যক্তি বলে মনে করি।

মানুষ, তার আত্মা, তার সমস্ত অস্তিত্ব—এ সবই হচ্ছে শিল্পের উপাদান; কোন রূপ, কোন ছন্দ নেই এতে। এই উপাদানের বোঝা বাড়িয়ে তোলাই সত্যিকারের শিল্পীর কাজ নয়; তাঁর কাজ হচ্ছে একে রূপায়িত করা, ছন্দিত করে তোলা। এক এক সময় বাইবেল পড়তে পড়তে আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ি। বাইবেলে আছে, "আদিতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। চারিদিকে তখন শুধু বিশৃঙ্খলাই রাজত্ব করিত। তাই ঈশ্বর ভাঙ্গা মন লইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিলেন।"—ভাঙ্গামন নিয়ে তিনি ঘুরে ফিরছিলেন কারণ বিশৃঙ্খল জড়পদার্থ ছাড়া আর কিছুই তখন ছিল না।

"ঈশ্বর বলিলেন, 'আলো চাই।' আলো আসিল।"—এবং এই হচ্ছে

প্রথম আত্মজ্ঞানের উন্মেষ। বস্তু নিজেকে এই প্রথম চিনতে পারল, প্রথম উষার আলোয় নিজের সঙ্গে পরিচয় হোল ঘনিষ্ঠ ভাবে।

"ঈশ্বর আলো দেখিলেন এবং তাহা তাঁহার মনঃপূত হইল। তখন তিনি আলো হইতে অন্ধকারকে পৃথক করিয়া দিলেন।"—'পৃথক করিলেন' অর্থাৎ পদার্থের গুণাবলী বিশ্লেষণ করে শৃঙ্খলা আনলেন।

এখানেই ঈশ্বর ক্ষান্ত হলেন না। "ঈশ্বর আকাশের নীচেকার জল হইতে উপরের জল ভাগ করিয়া দিলেন এবং আকাশকে স্বর্গ আখ্যা দিলেন। ঈশ্বর বলিলেন, 'স্বর্গের নীচেকার জল একত্র হউক এবং শুষ্কভূমি দেখা দিক।' ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালিত হইল। শুষ্কভূমির নামাকরণ হইল পৃথিবী।"

আদিতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন;—অতএব এ থেকে আমরা এটুকু জানতে পারি যে স্বর্গ অথবা পৃথিবী আপনা থেকেই সৃষ্ট হয়নি। উপাদনগুলো মাত্র ছিল, ঈশ্বর এদের তাঁর মনোমত করে সাজিয়ে নিয়েছেন,—তাতে নতুন রূপ দিয়েছেন। এবং এই সাজিয়ে নেওয়া, নতুন রূপ দেওয়াই হচ্ছে ঈশ্বরের শিল্প সৃষ্টি। আমি ধর্মতত্বজ্ঞ নই, সঙ্গীতের পূজারী মাত্র। তাই বাইবেলের এই অংশ আমি এমনি করেই ব্যাখ্যা করি।

আদিতে আপনিও ঠিক এমনিতরই বিশৃঙ্খল জড়পদার্থের সমষ্টি ছিলেন। আপনি, আপনার জীবন, আপনার অহংবোধ, আপনার প্রতিভা—সমস্তই শুধু জড়বস্তু;—সৃষ্টি নয়, সৃষ্টির উপাদান। আত্মস্ফীতির যতই চেষ্টা করুন না কেন, স্থির জানবেন সেই মুহূর্তে আপনি খাপছাড়া কতকগুলো জড়বস্তুর সমন্বয় বই কিছুই নে। আর সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর যেমনি করে ভাঙ্গা মন নিয়ে ঘুরে ফিরছিলেন ঠিক তেমনি করেই আপনারও ঈশ্বর আশ্রয়ের অভাবে আপনার চারদিকে ঘুরে মরছেন। এই খাপছাড়া উপাদানগুলো সাজিয়ে তুলতে হলে, এদের রূপ দিতে হলে আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোকে ভাগ করে দেওয়া, আলো-আঁধারের সীমানা নির্দ্দেশ করা। তখন সৃষ্টির আদিতে

যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনি করেই আপনি আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাবেন, অবিদ্যা ভয়ে গা ঢাকা দেবে বীভৎস অন্ধকারের আড়ালে।

আপনি আপনার নিজের এবং চারপাশের জড়পদার্থগুলোকে রূপ দিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলছেন,—এবং এই হচ্ছে আপনার শিল্প সৃষ্টি। সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে শ্রেণী বিভাগ করা এবং আলো-আঁধারের সীমানা নির্দ্দেশ করে দেওয়া। অনাদিকাল থেকে সেই একই সুর ভেসে আসছে —'বিশ্লেষণ কর! বিভাগ কর!!' ঈশ্বরের আদিম সৃষ্টির মূলেও রয়েছে ঐ একই নির্দ্দেশ। আপনি শিল্পী, আপনাকেও ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে;—পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা-ছোঁয়ার ভেতরে সমস্ত কিছুর সীমানা এঁকে দিতে হবে। তারপর যে শিল্প সৃষ্টি হবে সেখানে আপনার ব্যক্তিগত কিছুরই স্থান নেই,—চুলোয় যাবে অহংবাদ আর তার নির্লজ্জ প্রকাশ।

তাই আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে ঈশ্বরের সেই সনাতন বিধান,— বিশ্লেষণের বাণী। এর ব্যতিক্রম হলেই হবে দুষ্ট শিল্পের সৃষ্টি। ব্যক্তিগত কিছু এসে জায়গা জুড়ে বসবে সৃষ্টির মাঝে, লণ্ডভণ্ড করে দেবে সমস্ত শৃঙ্খলা, নিষ্কলুষ আবহাওয়া কলুষিত হয়ে জায়গাটি ভগবানের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।

বেশীর ভাগ শিল্পীই হচ্ছে এই শ্রেণীয়। শুধু উপাদানের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতেই জানেন, সাজিয়ে গুছিয়ে নেবার সামর্থ্য নেই। এমনি করে সৃষ্টিছাড়া জঞ্জালের পাহাড়ই শুধু জমা হবে আর তা থেকে বেরুবে দুর্গন্ধ। ভগবানের সেই শৃঙ্খলা আর সংযমের বাণী উপেক্ষা করবার ধৃষ্টতাই তাঁদের রয়েছে, আর কোন গুণ নেই।

সৃষ্টির আদিতে শয়তান যেমন ভগবানের শিল্পসাধনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিল ঠিক তেমনি করে শয়তান বহুভাবে আপনার শিল্পসাধনায়ও বাধা সৃষ্টি করবে। শিল্পের জগতে শয়তানের প্রবেশ নিষেধ, কারণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার নেই। তবু সে আসবে এই পবিত্রভূমিতে,—আত্মশ্লাঘার মুখোস পরে চোরের

মত লুকিয়ে লুকিয়ে আসবে সে। সুযোগ খুঁজবে কি করে আপনার শিল্প-মন সে দখল করে বসবে। তার নগ্নরূপ আপনি জেনে ফেলবেন এই ভয়ে সে আপনারই রূপ ধরে আপনার কাছে আসবে। আপনার কানে কানে বলবে, "এই আমি,—তোমার অহংবোধ, তোমার দেবতা। যতক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে আছি, তোমার কোন ভয় নেই। যা খুসী তুমি তাই করতে পার। তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই তুমি পূজো করবে না—এই হোক তোমার আদর্শ!"—এমনি করে মিথ্যা গর্ব্ব আর আত্মম্ভরিতা দিয়ে শয়তান আপনার পবিত্র শিল্প-মন কলুষিত করতে চেষ্টা করবে। সৃষ্টি করার ক্ষমতা শয়তানের না থাকলেও সৃষ্টিছাড়া জঞ্জালের বোঝা বাড়াতে তার জুড়িদার নেই।

ভুলে যাবেন না যে ন্যায়-অন্যায়ের বাইরে শিল্প নয়। একে ভর করে আপনি একদিকে যেমন শুচিতার শিখরে পৌঁছুতে পারেন, অন্যদিকে তেমনি বিপথগামী হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। কোন্ পথে ধাবিত হবে আপনার শিল্প-মন তা নির্ভর করে সম্পূর্ণ আপনার ওপর,—আপনার শিল্প সাধনার ওপর। মনে রাখবেন, আপনাকে জাহির করবার জন্যে শিল্প নয় অথবা জোর করে আপনাকে কেউ শিল্প জগতে টেনে আনবে না। সমস্ত সাধনার মূলে রয়েছে বিষয়টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। আপনার শিল্পসাধনার মূলেও থাকবে সেই গভীর শ্রদ্ধা এবং জ্ঞান আহরণের প্রবল আকাঙ্খা।

আর অন্যদিকে রয়েছে দুষ্টশিল্প।

[জ্যান্ ট্রোজানের ডায়েরী] *

---

* এই পর্যন্ত লিখবার পরে ক্যারেল ক্যাপেকের মৃত্যু হয়। তাই বাকি অংশ তাঁর স্ত্রীর বিবৃতিতে পাওয়া যায়। অনুবাদক।

পরিশিষ্ট

লেখকের স্ত্রীর কথা—

স্বরশিল্পী ফন্টেনের শেষ জীবনের ঘটনাগুলো বিশদভাবে জানবার জন্যে আরো কয়েকজনের ডায়েরী উদ্ঘাটন করবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখকের ভাগ্যে তা হয়ে ওঠে নি। লেখকের হাতে লেখা মাত্র কয়েকটি কথা আমার কাছে রয়েছে এবং তা মৃত্যুর মতই বোবা,—তা থেকে উদ্ধার করবার মত কিছু নেই। তবু আমার কাছে এই কথাগুলোর মূল্য যথেষ্ট। এর ভেতর দিয়ে আমি আমার হারানো লোকটির মুখ, তাঁর কণ্ঠস্বর যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করছি।······সেই মিলন-মধুর দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে,—ঘরের ভেতর বসে আমরা দুটি জীব কথাবার্ত্তা বলতাম, আর ফন্টেনই ছিল আমাদের বিষয়। কিন্তু তখন কে জানত যে আমাদের এই সুখের মিলনের আড়ালে চির-বিরহ এসে উঁকি মারছে। তবু সেই দিনগুলোর প্রয়োজন ছিল, কারণ তা না হলে ফন্টেন-জীবনী অসমাপ্ত রয়ে যেত।

ক্যারেল ক্যাপেকের দৃষ্টিতে তাঁর নায়ক ছিল রক্তমাংসে গড়া এক জীবন্ত মানুষ। ক্যাপেক স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী ছিলেন, কিন্তু ফন্টেন সম্বন্ধে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতেন, চোখে মুখে তখন তাঁর এক অপূর্ব্ব আভা ফুটে উঠত। শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই তাঁকে সত্যিই অদ্ভুত দেখাত। আমার স্বামীর সান্নিধ্যে এসে ফন্টেনের কথা অনেক জানতে পেরেছি, আর তা পেরেছি বলেই অন্য কাউকে ডায়েরীর জন্য বিরক্ত করি নি। তাছাড়া, মৃত্যু যখন চির-শান্তি ডেকে আনে তখন কি বাইরের কারো বগবগ করা সাজে?

আমি জানি, ক্যারেল ক্যাপেক চেয়েছিলেন ফন্টেনকে দিয়ে তিনি গীতি-নাট্যটি মঞ্চস্থ করাবেন। ছল, চাতুরী, জুয়াচুরী, ফিকির-ফন্দি ফন্টেন শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়েছিল কিন্তু হয়ে উঠল শিল্প জগতের অদ্ভুত সঙ্। শিল্পী হওয়ার উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কোন গুণই ছিল না।

একদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আমি আর ক্যারেল ক্যাপেক মুখোমুখি আছি। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যাচ্ছিল না। ফন্টেন সম্বন্ধেই দের ভেতর আলোচনা হচ্ছিল। ক্যারেল ক্যাপেক বললেন, "এক সময়ে নের ভেতর হয়ত কিছু ছিল যা নিয়ে দিনরাত সে মশগুল হয়ে থাকত। জঘন্য মিথ্যাচার বেচারাকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। অজান্তে সে মিথ্যার তে পা বাড়িয়েছিল কিন্তু ফেরবার পথ ছিল না। ভ্রান্তির জাল তাকে ছেয়ে ছিল, সত্যের সঙ্গে তার মনের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ ছিল না। এ হেন লোকের পক্ষে কি শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব ?"

ফন্টেন যখন বড়লোক ছিল তখন টাকা দিয়ে সে তার শিল্প-পথের বাধা সরাতে কম চেষ্টা করেনি, কিন্তু তখন কেউ তার 'যুডিথ'কে গ্রহণ করেনি। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, যখন সে অপরিসীম দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে চলছিল তখন একদল লোক—তার 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী'—তার 'যুডিথ'কে লোক সমাজে প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর হোল।

ব্যাপারটি এই :—হাড়গোড়-বের-করা বেচা ফন্টেন তখন প্রতিরাত্রে নোংরা পল্লীগুলোতে ঘুরে বেড়াত। সেখানে নতুন ও পুরোনো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে তার দেখা হোত। তাদের কাছে ছেলেমানুষের মত সে আবোল তাবোল বকত, কাঁদত, মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকত। যাকে পেত তাকেই সে তার গীতি-নাট্যের কথা বলত। তারপর রাত অনেক হলে খালি মাথায় চুলের গুচ্ছ দোলাতে দোলাতে নিজের মনে বিরবির করতে করতে বাড়ী ফিরত। রাস্তায় তখনো দু'একজন যারা চলত তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। হয়ত বা

কোন সময়ে কোন বাড়ীর দেয়ালে হেলান দিয়ে হাতদুটো বুকের ভেতর চেপে ধরে মুখ চোখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে সে দাঁড়াত। রাস্তার বদমায়েসরা তাকে ঐ অবস্থায় দেখে মুচকি হেসে চলে যেত, কারণ ওরা কি বুঝবে কি ব্যথায় ফন্টেন দিনরাত জ্বলে পুড়ে মরছে!

ঠিক এমনি সময়ে একদল লোক এক মতলব আঁটল। তারা ঠিক করল যে ফন্টেনকে নিয়ে একটু ফুর্তি করতে হবে; বোকাটার দৌলতে না হয় খানিকটা হাসাই যাবে।

ফন্টেনের কাছে গিয়ে তারা বলল, "এই মস্ত ভুলটাকে সংশোধন করতেই হবে ফন্টেন। পৃথিবীর মাঝে তোমাকে দাঁড় করিয়ে তবে ছাড়ব।"

পাগল হয়ে ফন্টেন ছুটল। চেনা অচেনা অনেককে নিমন্ত্রণ করল, বিশেষ করে, যারা এক সময়ে তার 'যুডিথ'কে আ[illegible]দেয় নি তাদের কাছে গিয়ে বিষয়টা জোর গলায় জানিয়ে এল।

অভিনয়ের জন্যে একটি ঘর যোগাড় করা হোল। ঘরটিতে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখানো হোত। পর্দার পেছনে ছোট্ট একটি মঞ্চ, দু' বর্গগজের বড় হবে না। তবু সেই ঘরেই সমস্ত ব্যবস্থা করতে হোল কারণ পকেট ভারী ছিল না। নতুন আর বেকার অভিনেতা অভিনেত্রী জড় করে মহড়া স্থুরু হোল। মহড়ার সময় ফন্টেনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করবার বিষয়; পাগলের মত কেবল ছটফট করত। কিন্তু সবাই যে তখন তার আড়ালে তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করত তা সে বুঝতে পারত না। ফন্টেনের কথা-বার্তায় তারা বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করতনা, তাকে এক বিশেষ রকমের সঙ বলেই জানত। বেচারাকে কেউ এতটুকু বিশ্বাস করত না, কারণ শিক্ষার মুখোস পরে ভণ্ডামি করে সাময়িক ভাবে আসল রূপ লুকোনো চলে কিন্তু একদিন তা প্রকাশ পাবেই।

* * * * * অভিনয় চলছে। বাছাই করা দর্শকদের মুহুর্মুহু প্রশংসাবাদে ঘর মুখরিত হয়ে উঠছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফন্টেন বেরিয়ে এল পর্দার

বাইরে। চুলের গুচ্ছ ঝাঁকিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অদ্ভুত ভঙ্গি করে দর্শকদের ধন্যবাদ জানাল, চোখে তার কৃতজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টি। কিন্তু পরক্ষণেই তা কোথায় মিলিয়ে গেল, তার সেই আনন্দোচ্ছ্বাসিত মুখের ওপর হঠাৎ কে যেন কালি লেপে দিল। পৃথিবী তার নগ্নরূপ নিয়ে বেচা ফন্টেনের কাছে ধরা দিল। সে তার স্বরূপ এই প্রথম জানতে পারল পরিষ্কার ভাবে, এতটুকু বিকৃতি রইল না তাতে। ইতরামি করে, কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে যে চেয়েছিল সবার ওপর টেক্কা দিতে সেই বেচা ফন্টেনের আজ যেন নতুন করে পরিচয় হোল বাস্তবের সঙ্গে। মঞ্চের আলোতে সে তার বাছাইকরা দর্শকদের ভেতর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে এমন অনেককে দেখতে পেল। তাদের মনের ছবি তাদের চোখে মুখে স্পষ্ট প্রতিফলিত। ফন্টেন ভয়ে আঁৎকে উঠল।

এতক্ষণ যা প্রশংসাবাদ বলে মনে হচ্ছিল বাস্তবিক ত সেই ধরণের কিছুই নয়। লোকগুলো প্রাণভরে হাসছিল। সত্যি, হাসছিল! একটা ছোটখাট প্রহসন বৈকি! গ্রামির মুখোস পরে ফন্টেন গিয়েছিল দর্শকদের উপর এক বিরাট প্রহসন খাটাতে, কিন্তু ফল দাঁড়াল উল্টো। মুখোস খুলে গেল। হাসাহাসি, টেপাটেপির মাত্রা বেড়েই চলল।

ফন্টেনের ভেতরটা দলিত কুকুরের মত যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগল। লজ্জায় হতাশায় সে একেবারে ভেঙে পড়ল। টলতে টলতে পর্দার আড়ালে সে চলে গেল। বাইরের হৈ-হল্লোর, দাপাদাপি, টেবিল চাপড়ানি পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল।

মূর্ছা যেতেও যেন ফন্টেনের লজ্জা করছে, পালাবে এমন শক্তিও নেই। তাছাড়া পালাবার পথই বা কোথায়? বালকদল তার পথ আগলে বসে আছে; তাদেরও চোখে মুখে সেই একই দুষ্টুমিভরা হাসি।

চারদিক থেকে কথার বৃষ্টি এসে ফন্টেনকে অতিষ্ঠ করে তুলল,—

—"আপনাকে বাইরে ডাকছে!"

—"যান, ধন্যবাদ জানিয়ে আসুন!"

—"দর্শন দিন একটিবার!"

দর্শন না দিয়ে কি উপায় আছে? তারা যে আজ ফন্টেনকেই পৃথিবীর মাঝে দাঁড় করাতে এসেছে, তার স্বরূপ প্রকাশ করে তবে ছাড়বে—এই ছিল তাদের পণ। আনন্দটা তাদেরও খানিকটা উপভোগ করতে দিতে হবে বৈকি!

ভেতরের লোকেরা বারবার ফন্টেনকে ঠেলে দিচ্ছিল পর্দার বাইরে। কিন্তু প্রতিবার সে ফিরে এল তাদেরই মাঝে।

বেচা ফন্টেনের জীর্ণ গৌরব তখন মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল। চেহারার সেই সৌষ্ঠব আর নেই, ঝাঁকড়া চুলের গুচ্ছ তার বিবর্ণ মুখের ওপর এসে পড়েছে, জামা বেয়ে অনর্গল ঘাম ঝরছে। পা দুটো তার ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে। এই অদ্ভুত চেহারা নিয়ে যখন সে আবার তার হাত দুটো দিয়ে বুক চেপে ধরল তখন সকলের হাসি চরমে পৌঁছুল। এমনি করেই গর্ব্বস্ফীত প্রতিভার এক হাস্যকর পরিসমাপ্তি ঘটল।

ফন্টেনের নিঃশ্বাস আটকে আসছিল। মনে হতে লাগল পা থেকে মঞ্চটা সরে যাচ্ছে। একটামাত্র প্রশ্নই ঘুরে ফিরে তার মনে বারবার ঘা দিতে লাগল, —কেন? কেন এমন হোল? কেন এরা এমনিভাবে আমার পেছনে লেগেছে?—মনে হোল কে যেন ফন্টেনের গলাটা চেপে ধরেছে, কাঁদবে এমন শক্তি নেই। দাঁড়িয়ে থাকবার সামর্থটুকুও সে হারিয়ে ফেলল, বংশীবাদকের কাঁধের ওপর ঢলে পড়ল। নোংরা রুমাল দিয়ে ঘর্ম্মাক্ত মুখ মুছে নিল। এই ঘৃণিত আবহাওয়া তার আর এক মুহূর্ত্ত সইছে না; কি করে এ থেকে সে মুক্তি পাবে? ফন্টেন আজ কৃপাপ্রার্থী, কিন্তু কার কাছে সে কৃপা ভিক্ষা চাইবে? মনের অন্ধকারে অন্ধের মত সে হাতরাতে লাগল।

ফন্টেনের দুর্ব্বল শরীরটা বংশীবাদক শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, আর সেই মুহূর্ত্তে ফন্টেন ভগবানকে স্মরণ করবার পথ পেল;—

জীবন ভোর শুধু যুদ্ধ করেই গেলাম, দেহ মন জর্জরিত করলাম। হায় ভগবান, এই কি তার পরিণাম? একটামাত্র উদ্দেশ্যকেই চরম লক্ষ্য করে ছিলাম; চিরকাল তো তাকে সেবা করেই এসেছি, তাকে জীবন সর্ব্বস্ব মনে করেছি! কিন্তু ভগবান, একি করলে তুমি?—বেচা কস্টেন আর চুপ করে থাকতে পারল না, প্রাণের আবেগে কেঁদে উঠল।

অভিনয় পুরোপুরি আর হোলনা। দর্শকদের ভেতর যারা কস্টেনকে এতক্ষণ পাগল ভেবেছিল সত্যি সত্যি তারা কিন্তু তার সেই শোচনীয় পরিণতি একেবারেই আশংকা করেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অভিনয়ের মাঝ পথেই বেচা কস্টেন পাগল হয়ে গেল। সবাই মিলে তাকে পাগলা গারদে নিয়ে গেল, তার সেই ধার-করা কোটটা তখনও তার গায়ে ছিল। স্বর্গতঃ লেখকের কাগজ পত্তর ঘেঁটে দেখেছিলাম এর পরে পাগলা গারদের কর্মসচিব কস্টেনের সম্বন্ধে কিছু বলবেন। আমি শুধু শ্রীমতী ফন্‌টিনোভার ডায়েরী আর লেখকের কাছ থেকে যা জেনেছি তা থেকে এটুকু বলতে পারি যে গারদে আসবার দুদিন পরে কস্টেনের মৃত্যু হয়।

সেদিনের সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়ছে,—আমাদের দাম্পত্য-জীবনের শেষ সন্ধ্যা। ক্যাপেক আমাকে বলছিলেন, "বিরাট শোভাযাত্রা করে কস্টেনের শব বয়ে নেওয়া হয়েছিল। তার পুরোনো বন্ধু অনেকে এসেছিল,—কোন রকম বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে নয়,—একান্ত বন্ধু হিসেবেই। জীবনে পর্যায় এড়ানো অসম্ভব, কিন্তু মৃত্যু এসে সমস্ত বিরোধ জয় করে নেয়। মানুষ মাত্রেই ভগবানের এই চরম দান মৃত্যুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে।

"শ্রীমতী ফন্‌টিনোভার মনটা বেশ নরম ছিল। পরিবারের নাম সে কোন মতেই খোয়াতে দেয়নি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভালভাবে সম্পন্ন করতে এতটুকু কার্পণ্য সে করেনি। তাছাড়া শবদাহের সময় একাডেমির এক মর্য্যাদা শিক্ষক হ্যাণ্ডেলের লার্গো বাজিয়েছিলেন আর একজন বিশিষ্ট

শিল্পী বাজিয়েছিলেন বিথোভেনের একটি সুন্দর রাগিণী। এমনি ক
সহরের বিশিষ্ট শিল্পীরা ফন্টেনের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন
জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা কিন্তু যুক্তি দেখাতে ভুলতেন না, বলতেন, 'আম
যা করেছি ঠিকই করেছি। একথা স্বীকার করি ফন্টেন শিল্পী নামে
অযোগ্য, চিরকালটা সে নিজেকে এবং পরকে ঠকিয়েই এসেছে। কি
সঙ্গে সঙ্গে এটাও অস্বীকার করবার নয় যে শিল্পই তার মৃত্যুর একমা
কারণ।'

"জীবন-ভোর ফন্টেনের এই জঘন্য আত্মপ্রতারণার পেছনে যে এতটুক
অকৃত্রিমতা ছিল না তা নয়। হয়ত তা আমল দেবার মত কিছু নয়
তবু মনে রাখতে হবে, ভগবানের বিচারে কানাকড়িরও হি
থাকে।

"তাই মিথ্যায় জর্জরিত হয়েও অন্তিম শয্যায় ফন্টেন প্রকৃত শিল্পীর সম্মা
পেয়েছিল।"